গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়ার বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৫৬ বর্ষ ৩ সংখ্যা ১৫ আগস্ট ২০০৩ | প্রধান সম্পাদক ঃ রণজিৎ ধর | মূল্য ঃ ১.৫০ টাকা

গণআন্দোলনের শপথে ভাস্বর ৫ই আগস্ট

৫ই আগস্ট সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষ স্মরণ দিবসে দলের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির ডাকে কলকাতার রানি রাসমণি রোডে বিশাল জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন দলের কেন্দ্রীয় কমিটির প্রবীণ সদস্য কমরেড অনিল সেন। প্রধান বক্তা ছিলেন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ। বিকাল ৪টায় মাল্যদানের মধ্য দিয়ে সভার কর্মসূচি শুরু হয়। দলের সমস্ত জেলা সম্পাদক, ফ্রন্ট ও গণসংগঠনের নেতৃবৃন্দ কমরেড শিবদাস ঘোষের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান। কমরেড শিবদাস ঘোষের উপর রচিত সঙ্গীত পরিবেশন করেন দলের সঙ্গীতগোষ্ঠী। দলের কিশোরবাহিনী কমসোমলের সদস্যরা কুচকাওয়াজের মাধ্যমে সর্বহারার মহান নেতার প্রতি গার্ড অব অনার জানান। সভাপতি ও প্রধানবক্তার সঙ্গে মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য সম্পাদকমন্ডলীর বিশিষ্ট সদস্যরা।

বিশাল সমাবেশের সামনে সভার সভাপতি কমরেড অনিল সেন বলেন, কমরেড শিবদাস ঘোষ কৈশোরেই স্বাধীনতা আন্দোলনে যুক্ত হয়েছিলেন। স্বাধীনতা আন্দোলনের মধ্যেই তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, ব্রিটিশ শাসকদের হটিয়ে দিয়ে দেশ স্বাধীন করতে পারলেও, দেশের শোষিত মানুষের মুক্তি আসবে না। কারণ, দেশে একটি সঠিক সাম্যবাদী দল নেই। সেদিন জেলের মধ্যে থেকেই তিনি প্রচেষ্টা শুরু করেন যাতে ভারতের মাটিতে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের উপর নির্ভর করে একটি সত্যিকারের সাম্যবাদী দল গঠন করা যায়। এই স্বপ্ন ও আদর্শ নিয়ে তিনি নিরবচ্ছিন্নভাবে যে সংগ্রাম করেছেন, সেই সংগ্রামেরই শ্রেষ্ঠতম সৃষ্টি হল ভারতের মাটিতে একমাত্র সাম্যবাদী দল এস ইউ সি আই। তাঁর জীবনব্যাপী সংগ্রাম, যেটা তিনি শুরু করেছিলেন মুষ্টিমেয় কয়েকজন সহযোদ্ধাকে নিয়ে, সেই ক্ষীণ শক্তি আজ ভারতের প্রায় সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে এক বিরাট আকার নিয়েছে। রাজ্যে রাজ্যে আজ আমাদের দলের নেতৃত্বে জনগণের দাবি নিয়ে, কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্যগুলিতে নানা দলের জনবিরোধী সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে উঠছে। বর্তমান সাধারণ সম্পাদক কমরেড নীহার মুখার্জীর পথনির্দেশে পুঁজিবাদবিরোধী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের লক্ষ্যে দলের নেতা ও কর্মীরা অবিরাম সংগ্রাম করে যাচ্ছেন। গুরুতর অসুস্থতা সত্ত্বেও কমরেড নীহার মুখার্জী আমাদের সর্বদা পথ দেখাচ্ছেন, যা পাথেয় করেই আমরা ক্রমাগত এগিয়ে যাচ্ছি।

তিনি বলেন, ভারতের মাটিতে মার্কসবাদকে বিশেষীকৃত করার মধ্য দিয়ে কমরেড শিবদাস ঘোষ দেখিয়েছেন — এদেশে পুঁজিবাদবিরোধী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের লক্ষ্য নিয়ে কীভাবে গণআন্দোলন গড়ে তুলতে হবে, জনগণের সংগ্রামী হাতিয়ারগুলি কীভাবে গঠন করতে হবে, কী ধরনের স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গড়ে তুলতে হবে। কোনও পুঁজিবাদী দেশে যদি কখনও সত্যিকারের একটি কমিউনিস্ট পার্টি কোনও অঙ্গরাজ্যের সরকারি ক্ষমতায় যেতে পারে, তাহলে কোন্ নীতির ভিত্তিতে, কোন্ আদর্শের ভিত্তিতে তারা সরকার পরিচালনা করবে, সেটা কমরেড শিবদাস ঘোষ দেখিয়েছেন। ১৯৬৭ সালে এই রাজ্যে প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠনের সময় এ প্রশ্ন দেখা দিয়েছিল। ঐ ফ্রন্টে যেমন আমাদের দল ছিল, তেমনই কিছু অ-বাম দল এবং বামপন্থী দলও ছিল যারা মুখে জনদরদের কথা বলে এবং জনগণের ক্ষোভকে ব্যবহার করে গদির রাজনীতি করে। সেদিন কমরেড শিবদাস ঘোষ বলেছিলেন, আমাদের দল এস ইউ সি আই তিনটি শর্তে সরকারের শরিক হতে পারে। প্রথমত, ন্যায়সঙ্গত গণতান্ত্রিক আন্দোলনে পুলিশি হস্তক্ষেপ করা চলবে না। দ্বিতীয়ত, যেসব দলের মিলিত ফ্রন্ট সরকারে বসেছে, তাদের কেউই দলীয় স্বার্থে প্রশাসনকে ব্যবহার করবে না। তৃতীয়ত, এই যুক্তফ্রন্ট সরকার কর্মসূচি রূপায়ণে আমলাতন্ত্রের উপর নির্ভর না করে জনগণের সংগঠিত আন্দোলনের উপর নির্ভর করবে। এই নীতির উপর ভিত্তি করে সেদিনের যুক্তফ্রন্ট সরকার সত্যিকারের গণআন্দোলনের হাতিয়ার রূপে আবির্ভূত হয়েছিল। কায়েমী স্বার্থবাদী, জোতদার-মালিক-পুঁজিপতিশ্রেণী, সাম্রাজ্যবাদী শক্তির

দুয়ের পাতায় দেখুন

ধর্মঘটের অধিকার প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় কমিটি

সরকারি কর্মচারীদের ধর্মঘটের অধিকারকে নিষিদ্ধ করে সুপ্রিম কোর্ট যে রায় দিয়েছে তার তীব্র নিন্দা করে এস ইউ সি আই কেন্দ্রীয় কমিটি ৭ আগস্ট তারিখে এক বিবৃতিতে বলেছেন ঃ

"সরকারি কর্মচারীদের ধর্মঘটের অধিকারকে খর্ব করে সুপ্রিম কোর্টের সাম্প্রতিক রায় অন্যায় এবং গণতান্ত্রিক অধিকারের উপর চূড়ান্ত আঘাত। শাসক পুঁজিপতিশ্রেণী ও শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত দলগুলি, যারা সমস্ত ধরনের গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে নির্মমভাবে খর্ব করতে উঠে পড়ে লেগেছে, এই রায় তাদেরকেই উৎসাহিত করবে।

আমাদের দেশের স্বাধীনতা আন্দোলন এবং বিভিন্ন দেশের মুক্তি আন্দোলন ও ফ্যাসিবাদ বিরোধী সংগ্রাম, সবগুলিই প্রচলিত শোষণমূলক রাজনৈতিক ব্যবস্থার আইনশৃঙ্খলার ধারণাকে লংঘন করেই গড়ে উঠেছিল। অন্যদিকে ১৯৭৫ সালে আইনি পথে আমাদের দেশে যে আভ্যন্তরীণ জরুরি অবস্থা জারি করা হয়েছিল, তা ছিল স্বৈরতান্ত্রিক এবং দমনমূলক। ফলে, আইনের চোখে যা সঙ্গত, তা সবসময় ন্যায়সঙ্গত, উচিত ও নৈতিক নাও হতে পারে।

সেইজন্য, আমরা কর্মচারী, শ্রমিক ও খেটে খাওয়া মানুষের কাছে এই আহবান জানাচ্ছি যে, তাঁদের অধিকারের উপর এই আক্রমণের বিরুদ্ধে তাঁরা ঐক্যবদ্ধ প্রতিবাদ ধ্বনিত করুন।"

তামিলনাড়ুর ঘটনা দেখিয়ে দিল

আইনি দৃষ্টিভঙ্গিতে জনস্বার্থ আর সুরক্ষিত হতে পারে না

সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক সরকারি কর্মীদের ধর্মঘট করার অধিকার খারিজ করার উপর্যুপরি ঘোষণাকে কেন্দ্র করে গোটা দেশে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। ইতিপূর্বে সুপ্রীম কোর্ট 'বিশৃংখলা' দমনে 'বে-আইনি' ধর্মঘট মোকাবিলায় গৃহীত পদক্ষেপগুলির জন্য জয়ললিতা সরকারকে অভিনন্দন জানিয়েছিল। সরকারপক্ষ থেকে এমন পদক্ষেপের ভয়াবহ নজির যেমন এদেশে নেই — তেমনি নেই দেশের সর্বোচ্চ আদালতের খোলাখুলিভাবে লক্ষ লক্ষ মানুষের ওপর নিপীড়নের সপক্ষে প্রকাশ্যে সরকারকে সমর্থন করার নীতি।

এর ফলে এমন একটা উদ্বেগজনক পরিস্থিতির সৃষ্টি হল যেখানে সারা দেশের শ্রমিক-কর্মচারী-শিক্ষক-অধ্যাপক সহ সর্বস্তরের নির্যাতিত ও গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষের কাছে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে — ধর্মঘট করার মৌলিক ও প্রাথমিক অধিকারটুকু শেষপর্যন্ত থাকবে তো ? এমনকি এরাজ্যেও সিপিএম-ফ্রন্ট সরকার শ্রমিক-কর্মচারী আন্দোলন সম্পর্কে যে দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে চলছে তাতে স্বাভাবিকভাবেই এখানেও প্রশ্ন দেখা দিচ্ছে যে, এরাজ্যেও কি শ্রমিকদের ধর্মঘটের অধিকার সুরক্ষিত থাকবে ? যদিও একথা ঠিক, সিপিএম দলগতভাবে এবং তাদের শ্রমিক সংগঠন সিটু সুপ্রীম কোর্টের এই বক্তব্যের প্রতিবাদ জানিয়েছে এবং বিক্ষোভ কর্মসূচি গ্রহণ করেছে, তবুও মালিকশ্রেণীর সর্বাত্মক আক্রমণের

চারের পাতায় দেখুন

৬ আগস্ট ধর্মতলায় বিষাক্ত কোক-পেপসি নিষিদ্ধ করার দাবিতে বিক্ষোভ

উচ্চতর হৃদয়বৃত্তি এস ইউ সি আই'র রাজনীতির মূল কথা

একের পাতার পর

বিরুদ্ধে মেহনতী জনগণ, বিশেষত শ্রমিকশ্রেণীকে ঐক্যবদ্ধ করে নিরবচ্ছিন্ন গণআন্দোলনের জন্ম দিয়েছিল। এর প্রতিক্রিয়া কেবল পশ্চিমবঙ্গ ও ভারতবর্ষে নয়, আমেরিকা-ব্রিটেনেও পড়েছিল। ব্রিটেনের গার্ডিয়ান পত্রিকা, আমেরিকার ওয়াশিংটন পোস্ট 'গেল গেল' রব তুলে বলেছিল, পশ্চিমবঙ্গে জঙ্গলের আইন চলছে। পুঁজিপতিদের নির্মম শোষণ-নিপীড়নের বিরুদ্ধে শ্রমিকদের আন্দোলনকে কোনও সরকার সমর্থন জানালে যদি সেটা

কমরেড অনিল সেন

জঙ্গলের আইন হয়, কমরেড শিবদাস ঘোষ বললেন, তবে যে আইনে তোমরা শ্রমিকদের নির্মমভাবে শোষণ কর, সেটা গভীরতর জঙ্গলের আইন। যুক্তফ্রন্ট সরকারের শাসনে শ্রমিক-চাষী আন্দোলনের কী বিশাল জোয়ার সৃষ্টি হয়েছিল, অনেকেরই তা স্মরণে আছে। কীরকম কারসাজি করে সেই ফ্রন্ট সরকারকে ভেঙে দেওয়া হয়েছিল, সেটাও আপনারা জানেন। কিন্তু আবার বিপুল গরিষ্ঠতা নিয়ে যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠিত হয়েছিল। এমন একটা সরকারের তাৎপর্য হচ্ছে, যদি সত্য সত্যই সেই সরকার শোষিত জনগণের স্বার্থরক্ষার লক্ষ্য নিয়ে চলে, তবে বহু সীমাবদ্ধতার মধ্যেও সেই সরকার একদিকে যেমন জনগণের ন্যায্য কিছু গণতান্ত্রিক দাবিদাওয়া পূরণ করতে পারে, তার চেয়েও বড় জিনিস গণআন্দোলনের শক্তিবৃদ্ধি ও তাকে সংহত করতে পারে, পুঁজিবাদবিরোধী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের লড়াইকে দুর্বার গতিতে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে। সেদিন ঐ যুক্তফ্রন্ট সরকারের শরিক হিসাবে এস ইউ সি আই এই রাজনৈতিক লাইনই তুলে ধরেছিল।

সেদিনের সেই যুক্তফ্রন্ট সরকারের সাথে আজকের বামফ্রন্ট সরকারের তুলনা করে দেখুন। বিচার করে দেখুন তাদের নীতি কী? প্রায় প্রতিদিন মন্ত্রীরা বিবৃতি দিচ্ছেন, জঙ্গি শ্রমিক আন্দোলন করা চলবে না। পুলিশের বড়কর্তাদের অর্ডার মাফিক বলে দিচ্ছেন, যখন তখন মিছিল-মিটিং করা যাবে না, কবে কোন্ রাস্তা দিয়ে মিছিল যেতে পারবে, কোথায় কবে মিটিং করা যাবে সেটাও সরকারই ঠিক করে দেবে। এরাজ্যে শ্রমিকদের উপর কলে-কারখানায় চরম অত্যাচার-নিষ্পেষণ চলছে, কম মজুরিতে মালিকরা কাজ করাচ্ছে, ছাঁটাই করছে, লক-আউট করছে, কিন্তু শ্রমিকরা আন্দোলন করতে পারবে না। রাজ্যে কোটি কোটি বেকার। এদেরকে সরকারি দলগুলো ভোটে মাসলম্যান হিসাবে ব্যবহারের জন্য বিপথে চালিত করছে, সাট্টা জুয়া মদের প্রসার ঘটাচ্ছে। এক চূড়ান্ত নৈরাজ্যময় অবস্থা। এসব দিয়েই তো আপনারা বুঝতে পারেন — সেদিনের যুক্তফ্রন্ট সরকারের সাথে বর্তমান বামফ্রন্ট সরকারের কি আকাশ-পাতাল পার্থক্য। সেদিন যুক্তফ্রন্টে শুধুমাত্র এস ইউ সি আই ছিল বলে তার কী সংগ্রামী চরিত্র ছিল। আর আজকের বামফ্রন্টে আমাদের দল নেই, এই সরকারের নীতিতে বামপন্থাও নেই। তাই যেমন কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে, তেমনই পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিরুদ্ধেও আমাদের দল আন্দোলন করে যাচ্ছে।

আমরা ৫ই আগস্ট পালন করি কোনও অনুষ্ঠান হিসাবে নয়। আমরা পর্যালোচনা করে দেখি, ২০০২ সালে আমাদের যে শক্তি দুর্বলতা ছিল, ২০০৩ সালে আমাদের সেই শক্তি ও দুর্বলতা কোথায় দাঁড়িয়ে আছে, আরও কীভাবে আমাদের অগ্রগতি ঘটাতে পারতাম। আমরা বিচার করি, আমাদের মধ্যে যে নেতিবাচক দিকগুলি আছে তা আমরা কতটা দূর করতে পেরেছি। মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষ বারবার জনগণের কাছে আবেদন জানিয়ে বলেছেন, আপনারা যদি আমাদের দলের নেতা ও কর্মীদের ক্ষেত্রে দেখেন, আমরা যা বলছি তা জীবনে চর্চা করছি না, তাহলে আপনারা অবশ্যই সেকথা দলের নেতৃত্বের গোচরে আনবেন।

পরিশেষে ২১ আগস্ট বাংলা বন্‌ধকে গত বন্‌ধগুলির থেকেও ব্যাপকভাবে সফল করার জন্য জনগণের কাছে তিনি আবেদন জানান।

সভার প্রধান বক্তা কমরেড প্রভাস ঘোষ বলেন — ৫ আগস্ট দিনটি আমাদের দলের প্রতিটি কর্মী-সমর্থক-দরদী জনগণের গভীর আবেগের সঙ্গে যুক্ত। এই দিন আমরা প্রয়াত মহান নেতা, এ-যুগের বিশিষ্ট মার্কসবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষাগুলিকে স্মরণ করি এবং তার ভিত্তিতে সমসাময়িক পরিস্থিতিতে গণআন্দোলন, শ্রেণী সংগ্রামে আমাদের করণীয় কর্তব্য নির্ধারণ করি।

দেশের রাজনীতিতে যেখানে শুধু গদি নিয়ে মারামারি, লড়ালড়ি, নীতিহীনতা, আদর্শহীনতা দীর্ঘদিন ধরে চলছে — কংগ্রেস, বিজেপি, সিপিএম প্রত্যেকটি দল যেখানে শোষকশ্রেণী, শিল্পপতি, ব্যবসাদারদের সন্তুষ্ট করে তাদের আশীর্বাদপুষ্ট হয়ে গদি দখলের রাজনীতি করছে; সেখানে সম্পূর্ণ বিপরীত রাজনীতি কমরেড শিবদাস ঘোষ আমাদের সামনে উপস্থিত করেছেন। সেই রাজনীতির মূল কথাই হচ্ছে উচ্চতর হৃদয়বৃত্তি ; কোটি কোটি শোষিত নিপীড়িত মানুষের চোখের জল, বুকের বেদনাকে বহন করে অন্যায়, অত্যাচার, শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া। কমরেড শিবদাস ঘোষ দেখিয়েছেন, সমাজ যেমন ধনী-গরিব, শোষক-শোষিতে শ্রেণীবিভক্ত, তেমনি নামে এবং ঝান্ডার রঙে পার্থক্য যাই হোক রাজনীতিও দুটি। একটি রাজনীতি শোষকশ্রেণীর স্বার্থ রক্ষা করে, আর একটি রাজনীতি শোষণ অত্যাচারের বিরুদ্ধে গণআন্দোলন, বিপ্লবী আন্দোলন গড়ে তোলে।

আপনারা দেখছেন, যেই নির্বাচনের কথা উঠেছে অমনি চলছে সব তোড়জোড়। বিজেপি চিন্তন বৈঠক, কংগ্রেসের মন্থন বৈঠকে ঠিক হচ্ছে কে কী তাস খেলবে। মন্দির তাস, না বিদেশিনী তাস ? গরম হিন্দুত্ব, নরম হিন্দুত্ব, রিজার্ভেশন — এ নিয়ে জল্পনাকল্পনা। এরপর এঁরা চোখের জল ফেলবেন দেশের দুর্দশা দেখে, নানান প্রতিশ্রুতির ভন্ডামি আবার চলবে। আবার ভোট নিয়ে খুনোখুনি, রক্তপাত হবে।

সিপিএম-ও পিছিয়ে নেই। তাঁরাও নির্বাচনে সাম্প্রদায়িকতা ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলবেন। শুধু আওয়াজ — লড়াই নয়। তিনি বলেন — সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে দেশব্যাপী আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য আমাদের কেন্দ্রীয় কমিটি সিপিএমের কেন্দ্রীয় কমিটির কাছে যে চিঠি দিয়েছিল, ওরা তার উত্তর পর্যন্ত দিল না। উগ্র হিন্দুত্ববাদ, ধর্মীয় মৌলবাদ, সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ তীব্র আদর্শগত সংগ্রাম চালানোর প্রশ্নে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে তারা রাজি হল না। শুধু পশ্চিমবঙ্গে একদিন যৌথ মিছিলের প্রোগ্রাম করল।

ইরাকের ওপর মার্কিন হামলার বিরুদ্ধেও আমরা যৌথ আন্দোলনের আবেদন জানিয়েছিলাম। তারা একটা কনভেনশন ও মিছিলের চেয়ে বেশি কিছু করতে রাজি হল না। অথচ ভিয়েতনামের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে, কিউবা, কঙ্গো, আলজিরিয়ার পক্ষে এই ভারতবর্ষে কী ঝড় উঠেছিল ! আমরা মার্কিন পণ্য বর্জনের আহ্বান জানালে তারা সাড়া দিল না। মার্কিন পুঁজি অসন্তুষ্ট হলে মুশকিল। এই তাদের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতা !

তিনি বলেন — ভারত রাষ্ট্র মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সহযোগী হয়ে তাদের সঙ্গে একের পর এক সামরিক চুক্তি করছে। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ চাইছে ইরাকে ভারত সৈন্য পাঠাক। এজন্য তেলের ভাগ, কনস্ট্রাকশন অর্ডার পাওয়ার লোভ দেখাচ্ছে। দক্ষিণ এশিয়ার আঞ্চলিক সুপার পাওয়ার হিসাবে ভারতকে স্বীকৃতি দিচ্ছে। দেশের মানুষের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী মনোভাবের জন্য বিজেপি সেনা পাঠানোর প্রশ্নে রাষ্ট্রসংঘের তক্‌মা চাইছে। রাষ্ট্রসংঘে প্রস্তাব পাশ হলে ভারত সেনা পাঠাতে রাজি। তিনি প্রশ্ন তোলেন — দেশব্যাপী সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলনের যে জোয়ারকে সিপিএম মেরেছে, সেই জোয়ার যদি থাকত তাহলে ভারত সরকার মার্কিন-সহযোগিতার পথে যেতে পারত কি ?

আজ দেশের হিন্দুত্ববাদ ও সাম্প্রদায়িক শক্তি উত্থানের পিছনে সিপিএম-সিপিআইয়ের ভূমিকার উল্লেখ করে তিনি বলেন — '৭৭ সালে জনসংঘ আছে জেনেও সিপিএম জনতা সরকারকে সমর্থন করেছিল। আশির দশকের শেষে ভি পি সিং-কে প্রধানমন্ত্রী করতে জ্যোতি বসু ও বাজপেয়ী হাত মিলিয়েছিলেন। পুরনো ইতিহাস স্মরণ করিয়ে দিয়ে তিনি বলেন — জরুরি অবস্থার আগে, '৭৩-'৭৪ সালে ইন্দিরাবিরোধী আন্দোলনে যখন পশ্চিম ভারত, উত্তর ভারত কাঁপছে তখন ইন্দিরার পাশে দাঁড়িয়ে সিপিআই। দক্ষিণপন্থীরা আছে — এই অজুহাতে সিপিএমও এই আন্দোলনে এল না। কারণ ইন্দিরা গান্ধির সঙ্গে তখন তাদের তলে তলে

কমরেড প্রভাস ঘোষ

বোঝাপড়া। জনগণের ইন্দিরাবিরোধী আন্দোলনের সুযোগ নিল জনসংঘ। জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন জনসংঘ জনগণের মধ্যে পা রাখার জায়গা করে নিল। দেশব্যাপী এই আন্দোলনে কীভাবে বামপন্থী নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা যায় — এ নিয়ে কমরেড শিবদাস ঘোষ তখন গভীরভাবে চিন্তিত। পশ্চিমবঙ্গে তখন সিদ্ধার্থ রায়ের সরকার। পশ্চিমবঙ্গে আমরা ঐক্যবদ্ধ বামপন্থী আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানাই। কংগ্রেস অত্যাচার চালাবে এই অজুহাতে সিপিএম এই রাজ্যেও আন্দোলনে এগিয়ে এল না। বহু শহীদের রক্তরঞ্জিত হাত যার, সেই ধিক্কৃত প্রফুল্ল সেনের সঙ্গে তারা একদিনের একটা মিছিল করল। এর পিছনে তাদের নির্বাচনে ফয়দা তোলার পরিকল্পনা আমরা ফাঁস করে দেওয়ায় তারা ক্ষিপ্ত হয়ে বলল এস ইউ সি আই কুৎসা করছে। এই বলে তারা আমাদের সঙ্গে ইস্যুভিত্তিক ঐক্যটাও ভেঙে দিল। ১৯৭৫ সালের জুন মাসে সিউড়ির যুব সমাবেশে কমরেড শিবদাস ঘোষ বললেন — একক শক্তিতে আমাদের আন্দোলন করতে হবে। সেই আন্দোলনের ঝান্ডা আমরা আজও কমরেড নীহার মুখার্জীর নেতৃত্বে বহন করে যাচ্ছি।

সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষ প্রতিষ্ঠিত এস ইউ সি আই দল শুধু পশ্চিমবঙ্গে নয়, ভারতবর্ষের নানা রাজ্যে শ্রমিক, কৃষক মধ্যবিত্তের দাবি নিয়ে একটার পর একটা আন্দোলন করে যাচ্ছে। এই দলের কর্মীরা মার খায়, জেলে যায়, রক্ত দেয়, প্রাণ দেয়। অনেকে প্রশ্ন করেন, আপনাদের শক্তির উৎস কি ? আমাদের শক্তির উৎস মহান মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-কমরেড শিবদাস ঘোষের বৈপ্লবিক চিন্তাধারা।

কংগ্রেস, তৃণমূল, বিজেপি, সিপিএম বলে — তাদের এমএলএ, এমপি আছে, সরকার আছে, টাকা আছে, পাওয়ার আছে। তারা পারমিট, লাইসেন্স, চাকরি দিতে পারে, অপরাধ করলে প্রটেকশন দিতে পারে। এর দ্বারা তারা যুবশক্তিকে বিপথগামী করছে। আর কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষায় আমাদের দলের রাজনীতি লড়বার রাজনীতি ; রক্ত দেওয়ার, মরবার রাজনীতি।

আগামী ২১ আগস্ট আহূত বাংলা বন্‌ধ প্রসঙ্গে কমরেড প্রভাস ঘোষ বলেন — জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করতে প্রশ্ন তোলা হয় — বন্‌ধ কর্মনাশা। আন্দোলন, বন্‌ধ করে কী লাভ হচ্ছে ? এর ফলে ক্ষতি হচ্ছে, উন্নয়ন ব্যাহত হচ্ছে। আমরা বলি — আন্দোলনের জোরেই আমরা সরকারের কিছু আক্রমণকে রুখতে পেরেছি। সিপিএম বলেছিল — প্রাথমিক স্তরে ইংরাজি আর চালু হবে না, এটা সেটলড ফ্যাক্ট। ১৯ বছর লড়াইয়ের পর সেটা আনসেটলড হয়েছে। '৮০-র দশকে কয়েকবার এবং এবারও পরিবহণের ভাড়া কিছুটা হলেও কমানো গিয়েছে। গত বছর ১০ জানুয়ারি বন্‌ধ করে হাসপাতালের চার্জ আমরা কিছুটা কমিয়েছি। ওরা বলেছিল, সর্বোচ্চ ১৫০০ টাকা আয় হলে ফ্রি-চিকিৎসা পাবে, আন্দোলনের ফলে সর্বোচ্চ আয় ২০০০ টাকা করা গিয়েছে। গত ২৭ জানুয়ারির বন্‌ধ এবং বিল বয়কটের পর আদালতের স্থগিতাদেশে সিইএসসি-র কয়েকশো কোটি টাকা লুঠ করা বন্ধ হয়েছে। আন্দোলনের ফলে কিছু স্কুলের ফি কমেছে, মেডিক্যাল শিক্ষায় ফি কমেছে। আন্দোলন ছাড়া এগুলি আদায় করা কি সম্ভব ছিল ?

তিনি বলেন — দাবি আদায় না হলেও আমরা আন্দোলন করব। সমস্ত

তিনের পাতায় দেখুন

৫ আগস্ট কলকাতায় বিশাল সমাবেশ

দুয়ের পাতার পর

যুগের বড় মানুষরা এই শিক্ষাই দিয়ে গিয়েছেন যে, অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে লড়তে হবে। আন্দোলন, লড়াই, প্রতিবাদ সেইদিন থেমে যাবে যেদিন মনুষ্যত্ব ধ্বংস হবে, মানুষ অমানুষ হবে। যদি প্রতিবাদ না হয়, লড়াই না হয় তবে অত্যাচারী আরও বেপরোয়া হয়ে যায়। কিন্তু আন্দোলন হলে নতুন আক্রমণ করার আগে তাকে দশবার ভাবতে হয়।

আমরা আন্দোলন করি চরিত্র অর্জনের জন্য। আমার যে অন্যায়ের প্রতিবাদ করার সাহস আছে, তেজ আছে, বিবেক আছে, অত্যাচারের বিরুদ্ধে ঘৃণা আছে তারই প্রতিফলন ঘটে আন্দোলনের মধ্যে। যত আমরা লড়ব, তত লড়াইয়ের ক্ষমতা বাড়বে। যত স্বার্থপরতা, লোভ, নীচতা, কাপুরুষতাকে পরাস্ত করে সাহস, তেজ, মনুষ্যত্ব, বিবেককে জাগাব, ততই আমরা উন্নত চরিত্রের অধিকারী হব। এজন্যই আন্দোলন চাই। দাবি যদি আদায় নাও হয়, তবুও আমরা লড়ব মনুষ্যত্বের দাবিতে, ন্যায়নীতিবোধের দাবিতে। মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষ আমাদের এই শিক্ষাই দিয়েছেন।

তিনি বলেন, আমরা কলকারখানা খোলার জন্য আন্দোলন করছি, বন্ধের জন্য নয়। কিন্তু কোথায় উন্নয়ন ! কোথায় নতুন নতুন কলকারখানা খুলছে ? তিনি তথ্য ও পরিসংখ্যান দিয়ে দেখান বাজার অর্থনীতি কোন দেশে উন্নয়ন ঘটাতে পারেনি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সহ গোটা পুঁজিবাদী দুনিয়ায় তীব্র মন্দা। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর এতবড় সংকট আর আসেনি। লক্ষ লক্ষ শ্রমিক ছাঁটাই হচ্ছে। যুদ্ধ বাধিয়েও সাম্রাজ্যবাদ সংকট কমাতে পারছে না। ভারতবর্ষেও লক্ষ লক্ষ কলকারখানা বন্ধ, কোটি কোটি বেকার, অর্ধ-বেকার। পশ্চিমবঙ্গেও চিত্র একই। তিনি বলেন — এগুলো কি বন্ধ-এর জন্য হচ্ছে ?

তিনি বলেন, আমরা যে আন্দোলন করছি তা কোটি কোটি মানুষের মুক্তির প্রশ্নের সঙ্গে যুক্ত। মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষ শিখিয়েছেন, আন্দোলনের সামনে চাই বৈপ্লবিক আদর্শ। এযুগে মহান মার্কসবাদ-লেনিনবাদ সেই আদর্শের সন্ধান দিতে পারে।

তিনি বলেন, সিপিএমের আলখাল্লায় মার্কসবাদের ছাপ থাকায় ধুরন্ধর পুঁজিপতিশ্রেণীর মুখপাত্ররা সিপিএমকে দেখিয়ে বলে — এই হচ্ছে মার্কসবাদ। সিপিএম পশ্চিমবঙ্গের সংগ্রামী ঐতিহ্য ধ্বংস করেছে। এজন্য পুঁজিপতিশ্রেণী বারবার তাদের ক্ষমতায় বসাচ্ছে। আবার সিপিএমের সমস্ত অপকর্মের বোঝা মার্কসবাদের ঘাড়ে চাপাচ্ছে।

প্রসঙ্গক্রমে তিনি দেখান মহান মার্কসবাদী আদর্শে উদ্বুদ্ধ রুশ জনগণ সোভিয়েট বিপ্লবের পর অর্থনৈতিক ও চেতনার ক্ষেত্রে যে বিশাল অগ্রগতি ঘটিয়েছিল তা সেযুগের শ্রেষ্ঠ মানবতাবাদী মনীষীদের মুগ্ধ করেছিল। পুরোপুরি বিজ্ঞানের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা একমাত্র মার্কসবাদী দর্শন কেন আজকের যুগের সমস্যা থেকে সভ্যতাকে মুক্ত করতে পারে, কেন ধর্ম, মানবতাবাদ, জাতীয়তাবাদী আদর্শ তা পারে না — তা তিনি বিশ্লেষণ করে দেখান। সংশোধনবাদের কবলে পড়ে পূর্ব ইউরোপ ও সোভিয়েট ইউনিয়নে কেন প্রতিবিপ্লব ঘটেছে, তা মার্কসবাদের আলোকে তিনি ব্যাখ্যা করেন এবং এ প্রসঙ্গে সংশোধনবাদের বিরুদ্ধে লেনিন, স্ট্যালিন, মাও সে-তুঙের শিক্ষাগুলির উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, লেনিন, স্ট্যালিন, মাও সে-তুঙ, শিবদাস ঘোষ সবাই হুঁশিয়ারি দিয়েছেন, সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পরও সমাজতন্ত্র বিপন্ন হতে পারে। পুঁজিপতিশ্রেণী ক্ষমতাচ্যুত হলেও আবার তারা প্রতিবিপ্লব সংগঠিত করতে পারে। বিপ্লব হওয়ার সাথে সাথে বুর্জোয়া অভ্যাস, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য সমাজ থেকে চলে যায়না। যতদিন স্ট্যালিন বেঁচে ছিলেন রাশিয়ায় পুঁজিবাদ মাথা তুলতে পারেনি। কিন্তু পুঁজিবাদ যে ধীরে ধীরে শক্তি সঞ্চয় করছিল, কমরেড স্ট্যালিন মৃত্যুর আগে সে হুঁশিয়ারি দিয়ে গিয়েছিলেন। চীনেও এই প্রতিবিপ্লবের সম্ভাবনা বুঝেই মহান নেতা মাও সে-তুঙ মৃত্যুর আগে ঐতিহাসিক সাংস্কৃতিক বিপ্লব সংগঠিত করেছিলেন। কিন্তু সেই সাংস্কৃতিক বিপ্লবের ফল সংহত করার আগেই তাঁরও মৃত্যু ঘটল।

ইতিহাসের গতিপথে কীভাবে মার্কসবাদ একটি বিজ্ঞানসম্মত দর্শন হিসাবে গড়ে উঠেছে তা দীর্ঘ বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে দেখিয়ে তিনি বলেন — সমাজতন্ত্রের বিপর্যয়ের কারণ অনুসন্ধান ও সংশোধনবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে গিয়ে মার্কসবাদ আরও সমৃদ্ধ হয়েছে। লেনিন-স্ট্যালিনের পর মাও সে-তুঙ এবং তারপর কমরেড শিবদাস ঘোষ মার্কসবাদের উপলব্ধিকে আরও উন্নত করেছেন। আজকের দিনে বিপ্লব হবে মার্কস-এঙ্গেলস, লেনিন, স্টালিন, মাও সে-তুঙ, কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারায়।

তিনি বলেন — স্বদেশি আন্দোলনের যুগেই কমরেড শিবদাস ঘোষ বুঝেছিলেন, এদেশে একটি যথার্থ মার্কসবাদী দল না থাকার সুযোগে, স্বাধীনতা আন্দোলনে জনসাধারণের এত লড়াই, এত আত্মত্যাগ সত্ত্বেও পুঁজিপতিরা ক্ষমতায় আসছে। সেই সময়ই তিনি বর্তমান সাধারণ সম্পাদক কমরেড নীহার মুখার্জী সহ মুষ্টিমেয় সহযোদ্ধাকে নিয়ে শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী দল এস ইউ সি আই-কে গড়ে তোলার কঠিন ও অনন্য সংগ্রামে ব্রতী হন। আজ কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারা নিয়ে এস ইউ সি আই সারা ভারতে লড়ছে শুধু নয়, বিশ্বের নানা দেশের বিপ্লবীরা, রাশিয়া, কিউবা, জার্মানি, ফ্রান্স, ফিলিপাইনের বিপ্লবীরা আমাদের আহ্বান করে জানতে চাইছেন কমরেড শিবদাস ঘোষের বৈপ্লবিক চিন্তাধারা কী।

সি পি এমের ভোটসর্বস্ব, দুর্নীতিগ্রস্ত, গণ-আন্দোলনবিরোধী অবাম রাজনীতির স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করে তিনি বলেন — সিপিএম-কে দেখে মার্কসবাদ, কমিউনিজম বুঝবেন না। যে নিকৃষ্ট বুর্জোয়া রাজনীতির চর্চা কংগ্রেস-বিজেপি করে, মার্কসবাদের নামে সিপিএম সেই রাজনীতির চর্চা করছে। আমাদের রাজনীতি হল আন্দোলনের রাজনীতি। হাসপাতালের চার্জ, স্কুল-কলেজের ফি, কৃষকদের খাজনা, বিদ্যুতের চার্জ, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের লাইসেন্স ফি কমানো, বন্ধ কলকারখানা খোলা — এগুলি হল আমাদের আন্দোলনের আশু লক্ষ্য। আন্দোলনের অপর লক্ষ্য হল জনগণকে লড়তে শেখানো। অন্ধের মতো সমর্থন নয়, আমরা চাই জনগণ আমাদের রাজনীতি বিচার করুন। আন্দোলন সম্পর্কে মতামত দিন। নিজেরা কর্মসূচি স্থির করে আন্দোলন পরিচালনা করুন। লক্ষ লক্ষ মানুষের মতামত নিয়ে আমরা ২১ আগস্ট বন্‌ধ ডেকেছি। আমরা চাই জনগণ গণকমিটি গঠন করুন, বিচার করুন নেতৃত্ব ঠিক পথে চলছে কি না। আন্দোলন নিয়ে শুধু পার্টি ভাববে না, সকলকে রাজনীতি নিয়ে ভাবতে হবে, না হলে বার বার ঠকতে হবে। এজন্যই আমরা গণকমিটি চাই, চাই অসংখ্য সৎ সাহসী ভলান্টিয়ার, যারা মাথা উঁচু করে লড়বে, টাকা দিয়ে যাদের কেউ কিনতে পারবে না।

দেশের বর্তমান আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক সংকটের ভয়াবহ চিত্র তুলে ধরে তিনি বলেন — দেশের বড় বড় নেতা-মন্ত্রীরা বলছেন, 'উন্নয়ন হচ্ছে'। অথচ সর্বত্র, সব দিক অন্ধকার। এই সংকট থেকে বাঁচতে হলে মার্কসবাদ, কমিউনিজমকে গ্রহণ করতে হবে। কমিউনিজম নিয়ে এসেছে ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা থেকে মুক্ত নতুন বিপ্লবী চেতনা। ব্যক্তিকে সংকীর্ণ ব্যক্তিস্বার্থ থেকে মুক্ত হয়ে, সামাজিক স্বার্থ ও বিপ্লবের স্বার্থকে নিজের স্বার্থ হিসাবে গ্রহণ করতে হবে। বর্তমান চূড়ান্ত সঙ্কটগ্রস্ত মানবসভ্যতা মুক্তি চাইছে। আর তা আসতে পারে একমাত্র পুঁজিবাদবিরোধী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মধ্য দিয়ে। মার্কসবাদ-লেনিনবাদ, কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারা সেই বিপ্লবের পথপ্রদর্শক। একে হাতিয়ার করেই আমরা লড়াই করে যাব।

তিনি বলেন — মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের প্রতিকৃতির সামনে আমরা আজ আবারও শপথ নিচ্ছি — যে মহান স্বপ্ন নিয়ে সমস্ত বাধাবিপত্তি দুর্যোগকে অগ্রাহ্য করে তিনি যাত্রা শুরু করেছিলেন, নিজেকে তিলে তিলে ক্ষয় করে যে দল তিনি গড়ে দিয়েছেন সেই দলকে আমরা আমাদের শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে শক্তিশালী করব। যে উন্নত নৈতিকতার সন্ধান তিনি দিয়েছেন, শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে তা আয়ত্ত করার সংগ্রাম করে যাব। আমরা যে যতদিন বেঁচে আছি ততদিন সংগ্রামের ঝান্ডা বহন করে যাব এবং পরবর্তী বংশধরদের হাতে তা দিয়ে যাব। এই অঙ্গীকারই ৫ আগস্টের যথার্থ শ্রদ্ধাঞ্জলি।

এর পর আন্তর্জাতিক সংগীতের মধ্য দিয়ে সভা শেষ হয়।

৬ আগস্ট হিরোসিমা দিবসে অল ইন্ডিয়া অ্যান্টি ইম্পিরিয়ালিস্ট ফোরামের উদ্যোগে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধচক্রান্তের বিরুদ্ধে স্টুডেন্টস হলে গণকনভেনশন

কলেজ স্কোয়ারে বিদ্যাসাগর মূর্তির পাদদেশে শিক্ষায় ফি-বৃদ্ধি ও বেসরকারিকরণের বিরুদ্ধে সেভ এডুকেশন কমিটির আহ্বানে ৬ আগস্ট শিক্ষক ও শিক্ষাবিদদের অবস্থান।

হাসপাতালে চার্জবৃদ্ধির বিরুদ্ধে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের সামনে হাসপাতাল ও জনস্বাস্থ্য রক্ষা কমিটির অবস্থান। ৬ আগস্ট ২০০৩

শ্রমিক-কর্মচারীর ধর্মঘটের অধিকার পশ্চিমবঙ্গেও সুরক্ষিত থাকবে কি ?

একের পাতার পর

মুখে সিপিএম নেতারা দীর্ঘদিন সরকারে থেকে যেভাবে 'যখন তখন ধর্মঘট করা উচিত নয়', 'জঙ্গী শ্রমিক আন্দোলন চলবেনা', 'মিটিং-মিছিল নিয়ম মেনে করতে হবে' প্রভৃতি বলে আন্দোলন-ধর্মঘট বিরোধী মানসিকতা সৃষ্টি করে চলেছেন, তাতে এ প্রশ্ন দেখা না দিয়ে পারে না।

আবার ধর্মঘটের মত একটি মৌলিক অধিকার সুরক্ষিত করতে তারা যে কত তৎপর সে কথা বোঝাতে তাঁরা আদালতে মামলা করার কথাও বলেন। উল্লেখ করা ভাল, ১৯৯৭ সালে কেরালা হাইকোর্ট রায় দিয়েছিল ধর্মঘট নিষিদ্ধ করে। ২০০০ সালে কেরালার ঐ রায়কে সুপ্রীম কোর্ট বহাল রাখে। তখন সিপিএম মামলা করে। যথারীতি তা খারিজ হয়ে যায়। এবারও তামিলনাড়ুর ঘটনাবলী দেখিয়ে দিল আইনি দৃষ্টিভঙ্গির বেড়াজালের বাইরে অবস্থান না নিলে গণস্বার্থরক্ষা আর সুরক্ষিত হতে পারে না। অথচ এবারও তাঁরা প্রথমে মামলা লড়ার কথা বলেছিলেন। অর্থাৎ সমস্যাকে, প্রতিক্রিয়ার আঘাতকে তাঁরা আইনি দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার করলেন — যে আইন সর্বোচ্চ আদালতের রায়ের মধ্যে প্রতিফলিত হল ধর্মঘট, আন্দোলনকে 'বিশৃংখল' এবং 'বে-আইনী' বলার মধ্য দিয়ে। জয়ললিতা সরকারও ঐ ধর্মঘটকে 'বিশৃংখলা' বলে অভিযোগ করেছে, হাতিয়ার করেছে আইনকেই। আদালত-জয়ললিতা সরকার-সিপিএম নেতৃত্বের দৃষ্টিভঙ্গির এই ঐক্য বিভিন্ন ক্ষেত্রেই দেখা যাবে। দেখা যাবে অন্যান্য পুঁজিপতিশ্রেণীর দল, এমনকি বিজেপি-কংগ্রেসের সঙ্গেও দৃষ্টিভঙ্গি ও সরকারি পদক্ষেপের মধ্যে। পুঁজি ও শ্রমের নিয়ত সংঘর্ষে আবর্তিত সমাজে সংখ্যাগরিষ্ঠ নিপীড়িত জনতা ও শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামের প্রয়োজন-বোধের ভেতর থেকে জন্ম নেওয়া ন্যায়সংগত অধিকার ও তার ধারণা এবং নৈতিকতার দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে সংখ্যালঘিষ্ঠ পুঁজিপতিশ্রেণীর স্বার্থ এবং পুঁজিবাদী শোষণমূলক অর্থনীতিকে সুরক্ষিত করতে সরকার, রাষ্ট্র ও আইনের সুতীব্র সংঘাতে — সিপিএম-এর অবস্থান আইন-প্রশাসন-রাষ্ট্রের সপক্ষেই। আর তা করতে গিয়ে দু-মুখো নীতি ও কৌশল সে নিয়েছে সর্বক্ষেত্রেই — মালিক তোষণ ও শ্রমিকশ্রেণীকে প্রতারণার হাতিয়ার হিসাবে।

৯ নভেম্বর জয়ললিতা সরকার ক্ষমতায় আসার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সার্কুলার দিয়ে বলা হল ....''very difficult to make bonus and exgratia payments in view of the financial crisis that the PSU and the government find themselves in''. 'অর্থ সংকটের' জন্যই যে সুযোগ সুবিধা, অর্জিত অধিকার খর্ব করা হচ্ছে — সরকারের মোদ্দা কথা এটাই। (ফ্রন্টলাইন)

আজ 'অর্থ সঙ্কটের' যুক্তিতে পশ্চিমবঙ্গেও সরকারি কর্মচারী, শিক্ষক সহ শ্রমিক কর্মচারীদের বেতন, বোনাস, মহার্ঘভাতা, পেনশনকালীন সুবিধা কি কাটছাঁট হচ্ছে না? স্বাস্থ্য, শিক্ষা থেকে উন্নয়ন বরাদ্দ কি ব্যাপকভাবে ছাঁটাই করা হচ্ছেনা? শিক্ষক-বিদ্যুত-শ্রমিক-সরকারি কর্মচারীদের যৌথ আন্দোলনে, অর্থনৈতিক ও গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার আন্দোলনে খোদ রাইটার্স বিল্ডিং-এ সরকার ঠ্যাঙাড়ে বাহিনী নামিয়ে আন্দোলনকারীদের নির্যাতন করেনি?

১৯৮৩ সালে ১০ অক্টোবরের 'গণশক্তি'র কয়েকটা লাইন স্মরণ করা যাক ঃ "ডাক্তারদের এক সাথে ধর্মঘট বা কর্মবিরতি পালন করা, রোগীর স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার স্বার্থের বিরুদ্ধে।" এর মানে হল ক্রমাগত স্বাস্থ্যখাতে ব্যয় কমাবেন সরকার, ফ্রি বেডের সংখ্যা কমাবেন, ওষুধ ছাঁটাই করবেন, বিনামূল্যে পথ্য ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার সুযোগ বাতিল করবেন, ফি বসাবেন, সরকারি হাসপাতাল বেসরকারি মালিকদের কাছে বিক্রি করবেন, ডাক্তারী পড়াশোনার সুযোগ ধনীদের কাছে বিক্রি করে দেবেন, স্বাস্থ্যকেন্দ্রের দুই-তৃতীয়াংশে ইনডোর চিকিৎসা উঠিয়ে দেবেন, কিন্তু এর প্রতিরোধে ডাক্তারদের ধর্মঘট করা চলবে না। করলে "রোগীদের স্বার্থ" ক্ষতিগ্রস্ত হবে। ডাক্তার নিয়োগে-নার্স নিয়োগে নিষেধাজ্ঞা চলবে, ঠিকায় কিছু কিছু লাগানো হবে — তা ডাক্তার-নার্সদের তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে হবে। এই নিষ্ক্রিয়তার মধ্য দিয়ে সরকারি আক্রমণে রোগীস্বার্থ ধ্বংস হতে দিয়ে শাসকদের দাসত্ব মেনে নেওয়াই হবে রোগীদের স্বার্থরক্ষা করা ! এই কুৎসিত যুক্তি কাদের স্বার্থে? এ ব্যাপারে আইনের আশ্রয় নেওয়াই বা কি জন্য? মুখে 'স্বাস্থ্য পরিষেবার উন্নয়ন' — কাজে ঠিক বিপরীত !

একইভাবে ইঞ্জিনীয়ারদের ধর্মঘট ও আন্দোলন দমন করার জন্য 'স্পেশাল পি ডব্লু ডি বোর্ড' নামে কালাকানুন জারি করা হয়েছে। 'গণশক্তি'র ৩রা মে ১৯৮৬ সংখ্যায় তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রীর বিবৃতিতে ঘোষণা করা হল ঃ "ইঞ্জিনীয়ার ও প্রযুক্তিবিদদের ধর্মঘট করার অধিকার নেই।" বিদ্যুৎ কর্মচারীদের বিরুদ্ধেও জারি হল কালা সার্কুলার (ডব্লু বি এস ই বি অফিস অর্ডার নং পি ৪৫৭, ২৪-৭-৮২)। বলা হল ঃ "ধর্মঘট, মিছিল, বিক্ষোভ, সীজওয়ার্ক, ওয়ার্ক টু রুল, গণছুটি, ইত্যাদিতে অংশ নিলে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে।" ঘেরাও এই রাজ্যে আগেই বে-আইনী হয়েছে। সম্প্রতি পথ ও রেল অবরোধ বেআইনি করা হয়েছে, ভারতবর্ষে কোথাও যা এখনো হয়নি। ধর্মঘট ও আন্দোলনের অধিকার এভাবেই তাঁরা সর্বক্ষেত্রে হরণ করে চলেছেন।

এই রাজ্যেই শিক্ষকদের চাকরির বয়ঃসীমা ৫ বছর ১৯৮১ সালেই কমানো হয়েছে। পি-এফ'র কনট্রিবিউটারি অংশের পুরো টাকা সুদ সহ বাজেয়াপ্ত করে নেওয়া হয়েছে। এই অর্থের পরিমাণ ১০০ কোটি টাকা (গণদাবী — ৫৪ বর্ষ ২২ সংখ্যা)।

শ্রমিকদের অবস্থা এ রাজ্যে খুবই করুণ। ২০০১ সালে শ্রমিক ধর্মঘট হয়েছে মাত্র ২০টা। আর মালিকদের দ্বারা লক-আউটের সংখ্যা ৩০৯টা। আর এইজন্যই ১ লাখ ৯৮ হাজার শ্রমিক পশ্চিমবঙ্গে কাজ হারিয়েছে। পরের বছর শ্রমিক ধর্মঘটের সংখ্যা মাত্র ২৯টা। লক-আউটের সংখ্যা ৩৪২টা। এজন্য কাজ হারাতে হল ১ লাখ ৪৮.৫ হাজার শ্রমিককে (সূত্র ঃ লেবার ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল)। এই তথ্য থেকে দেখা যাচ্ছে মালিকদের আক্রমণ প্রায় একতরফা, প্রতিরোধ নগণ্য।

সম্প্রতি শরিক দল আর এস পি'র শ্রমিক সংগঠন ইউ টি ইউ সি অভিযোগ করেছে উত্তরবঙ্গের চা-বাগানে লক-আউটের ফলে অন্তত চারশ' শ্রমিক অনাহারে, বিনা চিকিৎসায় রোগ-ভোগে মারা গেছে। সংবাদপত্রে এর আগেই প্রকাশ পেয়েছে যে, তিন দিনের বেতনের বিনিময়ে ছয় দিন কাজ করার শর্ত মেনে নিয়ে শ্রমিকদের কাজে যোগ দিতে বাধ্য করা হয়েছে। তাদের মজুরিও সবচাইতে কম। শুধু তাই নয়, চা-বাগান তারা বিক্রিও করে দিচ্ছে। যেমন শিলিগুড়িতে ৭৫০ একর এলাকা সম্পন্ন এক বাগানে লক্ষ্মী টাউনশিপ কোম্পানিকে ৪০৪ একর জমি মাত্র ১৪ কোটি টাকায় অর্থাৎ বিঘা প্রতি ১ লাখ ১৫ হাজার টাকায় বিক্রি করে দেওয়া হল (সূত্র ঃ গণশক্তি ২৯-৫-০২)। তারপর ২৬ জুন শ্রমিকদের উচ্ছেদ করতে শুরু হল পুলিশি অভিযান। এই প্রতিরোধ আন্দোলনে নির্মম অত্যাচার হল, একজন শ্রমিক শহিদ হলেন। চাঁদমণি চা বাগানের মাটি শহিদের রক্তে লাল হয়ে উঠল। আবার এই সরকারই সরকারি সম্পত্তি জলের দরে বেচে দেওয়ার জন্য কেন্দ্রের বিরুদ্ধে বক্তৃতা দেবে ! শ্রমিকদের স্বার্থ নিয়ে চিৎকার করবে !

শ্রমিকদের প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের টাকা মালিকরা মেরে দেয়, সরকার নিজেও দেয় না। এই ভূমিকার জন্য মালিকরা দুঃসাহসী হয়ে উঠেছে। পি-এফ তছরূপে রাজ্য শীর্ষে। অথচ সি পি এম নেতৃত্ব শ্রমিক আন্দোলনের ধ্বংসস্তূপে দাঁড়িয়ে এখনও শিল্পে শান্তিরক্ষার কথা বলে যাচ্ছেন। কার স্বার্থে? জয়ললিতা সরকারের মতই রাজ্য সরকারের অর্থ দফতর ২৬ জুলাই সার্কুলার জারি করেছে (মেমো নং ৬৭৭৯ এফ)। এতে বলা হল ১লা এপ্রিল থেকে জি পি এফের, সি পি এফের ১.৫% সুদ কমবে। রাজ্যে দশ লাখ সরকারি কর্মচারী এবং ৯০ লাখ বেসরকারি কর্মীর আর্থিক ভবিষ্যতের ওপর এটা কত বড় আঘাত। হিসেব করে দেখা যাচ্ছে, প্রতি মাসে জমা টাকার ওপর পঞ্চাশ থেকে আট'শ টাকা পর্যন্ত সুদ হারাবে কর্মীরা। চাকুরীজীবী নিম্নবিত্তের শেষ সহায়সম্বলের ওপর এই হীন আক্রমণ নামিয়ে আনল সি পি এম সরকার 'অর্থ সংকটের' বায়না রেখেই। অথচ কিছু দিন আগে এরাই ধর্মঘট-আন্দোলনের ডাকে আকাশবাতাস কাঁপিয়েছিল কেন্দ্রীয় সরকার পি এফের সুদ ১২% থেকে ১১% ও পরে ৯.৫% করে দেওয়ার প্রতিবাদে। দাবি রাখা হল ১২% সুদ রাখতে হবে। কি অদ্ভুত দ্বিচারিতা ! (সূত্র ঃ প্রতিদিন ২২ জুলাই ০৩)।

পশ্চিমবঙ্গে বিদ্যুতের মাশুলবৃদ্ধি, সিকিউরিটি ডিপোজিট বৃদ্ধি এবং অভিন্ন মাশুল নীতির বিরুদ্ধে বিদ্যুৎ গ্রাহক সমিতি 'অ্যাবেকা'র আন্দোলনকে ভুল প্রমাণ করতে রাজ্যের বিদ্যুৎমন্ত্রী মৃণাল ব্যানার্জী এবং সি পি এমের রাজ্য সম্পাদক অনিল বিশ্বাস বললেন, এই মাশুলবৃদ্ধির জন্য কেন্দ্র দায়ী। তাই আন্দোলন করা উচিত কেন্দ্রের বিরুদ্ধে, রাজ্যের বিরুদ্ধে নয়। বিদ্যুৎ মন্ত্রীর বক্তব্য ঃ সরকারের মাশুল নির্ধারণের ব্যাপারে কোন ভূমিকা নেই; বিদ্যুৎ গ্রাহক সংগঠনের কর্মীরা আন্দোলনকে বিপথে পরিচালিত করছে। এ ধরনের আন্দোলন করার পরিবর্তে তাদের উচিত হবে দিল্লীতে গিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মকর্তাদের কাছে বিদ্যুৎ মাশুলবৃদ্ধির ব্যাখ্যা চাওয়া। ... রাজ্য সরকার কিছুদিনের মধ্যেই কেন্দ্রীয় আইনের নির্দেশে রাজ্যে পারস্পরিক ভর্তুকি তুলে দেবে। (টেলিগ্রাফ ২৮-৬-০৩)। আর, সি পি এম নেতা অনিল বিশ্বাস বললেন ... আন্দোলনের নামে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করলে তা জনগণের বিরুদ্ধে যাবে ... সে ক্ষেত্রে সরকারকে ব্যবস্থা নিতে হবে। (গণশক্তি, ২৯ জুলাই '০৩)। ব্যবস্থা তারা নিয়েছিলেন। পুলিশ শুধু নয়, নামিয়ে ছিলেন ঠ্যাঙাড়ে বাহিনী।

অথচ এই সি পি এম দিল্লীতে কি করছে? বিদ্যুতের মাশুলবৃদ্ধির প্রতিবাদে দিল্লী রাজ্য কমিটির বক্তব্য রীতিমত আকর্ষণীয় ঃ "...বিদ্যুৎ বিলিব্যবস্থার বেসরকারিকরণের সরাসরি ফল হ'ল এই মাশুলবৃদ্ধি। রাজ্য সরকারের প্রতিশ্রুতি ছিল বিদ্যুৎ চুরি রুখে বিলি ব্যবস্থাকে জোরদার করতেই এই বেসরকারিকরণ। এমন দাবি করা হয়েছে বিদ্যুৎ চুরি কমিয়ে ডি ভি সি'র ঘাটতি কমানো সম্ভব হবে। একইভাবে বিদ্যুতের মাশুলবৃদ্ধি কমানো সম্ভব হবে। আজ এই দাবি মিথ্যা প্রমাণ হচ্ছে। বিদ্যুৎ বিলি মোটেই বাড়েনি। বিদ্যুৎ চুরি বন্ধ করতেও সক্ষম হয়নি বেসরকারি কোম্পানি। এদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার বদলে তাদের চুরির বোঝা সাধারণ গ্রাহকদের ঘাড়ে চাপানো হচ্ছে। এখন স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে গ্রাহকদের বিনিময়ে বেসরকারি হাতে মুনাফা দিতেই এই বেসরকারিকরণ। তাই দিল্লী রাজ্য কমিটির দাবি অবিলম্বে এই মাশুলবৃদ্ধির সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করা হোক।" (গণশক্তি ২৮-৬-'০৩)।

তাহলে প্রমাণ হচ্ছে, মাশুলবৃদ্ধির উদ্দেশ্য, বেসরকারিকরণের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সি পি আই (এম) নেতৃত্বের "স্পষ্ট" ধারণা আছে। তা যদি হয় তবে সেই স্পষ্ট ধারণা নিয়েই তাঁরা বেসরকারি হাতে বিদ্যুৎকে ধাপে ধাপে তুলে দিচ্ছেন। বেসরকারি মালিকদের মুনাফা জোগাতে, গোয়েঙ্কাদের মুনাফা জোগাতে চুরির বোঝা গ্রাহকদের ওপর চাপিয়ে দিচ্ছেন। চুরি

ছয়ের পাতায় দেখুন

ধর্মঘট প্রসঙ্গে সুপ্রিম কোর্টের রায় সম্পর্কে
ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণী
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদকের বিবৃতি

তামিলনাড়ুর সরকারি কর্মচারী ও শিক্ষকদের ধর্মঘটের পরিপ্রেক্ষিতে সুপ্রিম কোর্টের ডিভিশন বেঞ্চের ৬ আগস্টের রায়ের উপর প্রতিক্রিয়া জানিয়ে ৭ আগস্ট এক সাংবাদিক সম্মেলনে ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণীর পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক কমরেড শংকর সাহা বলেন —

"সুপ্রিম কোর্ট শ্রমিক কর্মচারীদের ধর্মঘট করার অধিকার দেয়নি, এই অধিকার শ্রমিকশ্রেণী বহু কঠিন কঠোর সংগ্রামের মধ্য দিয়ে অর্জন করেছেন। বিশ্ব শ্রমিক সংগঠন ILO এই গণতান্ত্রিক অধিকারের স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হয়েছে। তাই এই অধিকার কেড়ে নেওয়ার সুপ্রিম কোর্টের কোন এক্তিয়ার নেই। দেখা যাচ্ছে, ইদানিংকালে কোর্ট তার তথাকথিত নিরপেক্ষতা বিসর্জন দিয়ে শ্রমিকশ্রেণীর বিরুদ্ধে এই ধরনের রায় দিয়ে চলেছে।" তাই ধর্মঘট সহ যৌথ দরকষাকষির অধিকার রক্ষার জন্য ঐক্যবদ্ধ ভাবে ধর্মঘট সহ আরও বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তুলতে তিনি শ্রমিকশ্রেণীর কাছে আহবান জানান।

সিপিএম রাজনীতির স্বরূপ

যেখানে যেমন সেখানে তেমন

বিধানসভায় বিরোধীপক্ষে থাকলে মালিকশ্রেণীর বিরুদ্ধে আওয়াজ তোলা, আর সরকারি গদি দখল হয়ে গেলে সেই মালিকশ্রেণীকেই শোষণ-জুলুমে সাহায্য করা — সি পি আই (এম) নেতৃত্বের এটিই প্রধান বৈশিষ্ট্য। যতদিন তারা বিরোধী দল হিসাবে অবস্থান করে, ততদিন গরিব সাধারণ মানুষের ওপর নেমে আসা নির্মম অত্যাচারের বিরুদ্ধে অহরহ তাদের মুখে শোনা যায় প্রতিবাদের স্লোগান। শোষকশ্রেণীর অন্যায় জুলুমের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষকে একজোট করে লড়াইয়ের ময়দানে নামিয়ে তারা গদি দখলের রাস্তা সাফ করে। ঠিক সময়মত আন্দোলনে জল ঢেলে তাকে ব্যালট বাক্সে কবর দেয়। এভাবেই জনগণকে ঠকিয়ে সে ভর্তি করে নেয় নিজের ভোটবাক্স। কিন্তু যখন সে বিরোধী পক্ষ নয়, সরকারি গদি যখন তার দখলে, তখনই বদলে যায় 'জনদরদী'- 'শ্রমিকবন্ধু' সি পি এমের চেহারাটি। যে পুঁজিপতিশ্রেণীর বিরুদ্ধে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে তাদের ক্ষমতায় আরোহণ, সেই পুঁজিপতিশ্রেণীকে কতরকম উপায়ে তুষ্ট করা যায় — এবার তারই চেষ্টা শুরু হয়ে যায়। 'কমিউনিস্ট' নামধারী এই দলটি মালিকের পদলেহনে দক্ষিণপন্থী কংগ্রেস বা বিজেপি'র সঙ্গে রীতিমত প্রতিযোগিতায় নেমে পড়ে।

সি পি এমের শ্রমিক সংগঠন 'সিটু'র সাম্প্রতিক সর্বভারতীয় জেনারেল কাউন্সিলের অধিবেশনে তাদের এই বহুচর্চিত বিশেষত্বটি আরো একবার প্রকট হল। কটকে অনুষ্ঠিত এই অধিবেশনে উপস্থিত শ্রমিক নেতারা রাজ্যে রাজ্যে শ্রমিকশ্রেণীর ওপর বেড়ে চলা আক্রমণের বিষয়ে অত্যন্ত উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। ২৬ জুলাই ২০০৩ তারিখে সি পি এমের মুখপত্র 'গণশক্তি'র রিপোর্ট অনুযায়ী অন্ধ্রপ্রদেশ, কেরালা, তামিলনাড়ু ইত্যাদি রাজ্যের সি পি এম শ্রমিক-নেতারা বিভিন্ন ঘটনার উদাহরণ দিয়ে দেখিয়েছেন যে, ঐসব রাজ্যের শ্রমিকরা যেখানেই অত্যাচারের বিরুদ্ধে আন্দোলনের পথে গেছে, সেখানেই তাদের সরকারি পুলিশ বাহিনীর নিষ্ঠুরতার শিকার হতে হয়েছে। 'গণশক্তি'তে আরো প্রকাশ, অধিবেশনে উপস্থিত পশ্চিমবঙ্গের সি পি এম শ্রমিক নেতারা মত প্রকাশ করেছেন, এ রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় থাকায়, শ্রমিকদের ওপর আক্রমণের ঘটনা ঘটলেও তাদের অবস্থা নাকি কিছুটা ভিন্ন।

এ'কথা সত্য যে, ভারতবর্ষের প্রতিটি রাজ্যে শ্রমজীবী জনসাধারণের ওপর একের পর এক অত্যাচারের খড়্গ নেমে আসছে। মালিকরা ইচ্ছামত ছাঁটাই, লক-আউট, ক্লোজার করছে। বাধ্যতামূলক স্বেচ্ছাবসরের আঘাতে প্রতি মুহূর্তে কাজ হারাচ্ছে লক্ষ লক্ষ মানুষ। নানা ধরনের অগণতান্ত্রিক পদ্ধতি প্রয়োগ করে শিল্পপতি-পুঁজিপতিদের ধামাধরা সরকারগুলি শ্রমিকদের জীবনে সর্বনাশ ডেকে আনছে। দীর্ঘদিনের লড়াইয়ের দ্বারা অর্জিত অধিকারগুলি পর্যন্ত আজ হারাতে বসেছে শ্রমিকরা। পশ্চিমবঙ্গের শ্রমজীবী মানুষরাও তার ব্যতিক্রম নয়। এও ঠিক যে, কেরালা, অন্ধ্রপ্রদেশ, হিমাচল প্রদেশে যেখানে সি পি এম ক্ষমতায় নেই, সেখানে এসবের বিরুদ্ধে তারা প্রতিবাদে সরব। অথচ পশ্চিমবঙ্গে, যেখানে ক্ষমতায় আসীন খোদ সি পি এম-ফ্রন্ট সরকার, সেখানে সেই দলেরই নেতা-মন্ত্রীদের মুখে জঙ্গি শ্রমিক আন্দোলন বরদাস্ত না করার হুঙ্কার দিবারাত্র শোনা যাচ্ছে। স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে, এই দ্বিচারিতার কারণ কি? তা কি এই নয় যে, ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যে যেখানে তারা বিরোধী দল, এবং পশ্চিমবঙ্গে যেখানে তারা সরকারে আসীন — এই দুই অবস্থানে তাদের ভূমিকা আলাদা? অন্ধ্রপ্রদেশ, তামিলনাড়ুর মতো রাজ্যগুলিতে বিরোধী দল হিসাবে সি পি এমের মূল লক্ষ্য সরকারি গদি দখল করা; তাই সেখানে সাধারণ মানুষের সঙ্গে গলা মিলিয়ে মালিকশ্রেণীর চাপিয়ে দেওয়া অন্যায়ের বিরুদ্ধে তারা সরব। এই আন্দোলন-আন্দোলন খেলা তারা ততদিনই চালাবে যতদিন তারা সরকারবিরোধী পক্ষে থাকবে।

সিটুর সর্বভারতীয় অধিবেশনে উপস্থিত পশ্চিমবঙ্গের শ্রমিক নেতাদের মন্তব্য থেকে দ্বিতীয় যে প্রশ্নটি ওঠে, সেটি হল, কীসের ভিত্তিতে তাঁরা সিদ্ধান্ত করলেন — এ রাজ্যে শ্রমিকদের অবস্থা কিছুটা ভিন্ন? নথিভুক্ত এবং নথির বাইরে দেড় কোটি বেকারের এই রাজ্যে শ্রমিকদের ওপর প্রতি মুহূর্তে ছাঁটাইয়ের খড়্গ কি নেমে আসছে না? কলকারখানাগুলি এ রাজ্যে কি একের পর এক বন্ধ হয়ে যাচ্ছে না? যৌথ উদ্যোগের নামে সরকারি ক্ষেত্রে তারা বেসরকারি পুঁজিকে ডেকে তাদের মুনাফার ব্যবস্থা করে দিচ্ছে না? প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের টাকা চুরি করা সত্ত্বেও মালিকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া দূরে থাক, খোদ রাজ্য সরকার নিজস্ব রাষ্ট্রীয় সংস্থায় পি এফের টাকা লুঠ করেনি? অন্যান্য রাজ্যের মতোই সি পি এম-ফ্রন্ট শাসিত এই রাজ্যে 'স্বেচ্ছাবসর'-এর নামে বাধ্যতামূলকভাবে শ্রমিকদের অবসর দিয়ে দেওয়া হচ্ছে; শূন্যপদে লোক নিয়োগ বন্ধ করা শুধু নয়, সরকারি অফিসগুলিতেও শূন্যপদগুলি তুলে পর্যন্ত দেওয়া হচ্ছে। নামমাত্র বেতনে অভাবী মানুষকে দিয়ে কাজ করিয়ে নিতে, কিংবা ঠিকা শ্রমিক নিয়োগ করতে এ রাজ্যের সরকারের বিন্দুমাত্র আপত্তির লক্ষণ দেখা যাচ্ছে কি? অসংগঠিত শ্রমিকদের জন্য সারা বছরের কাজ বা তাদের ন্যূনতম মজুরি সুনিশ্চিত করার ক্ষেত্রে তাদের ২৬ বছরের শাসনকালে সি পি এম-ফ্রন্ট সরকার কতটুকু দায়িত্ব পালন করেছে?

আসলে ভোটে জিতে ক্ষমতা দখলের প্রথম মুহূর্তটিতেই সি পি এম নেতৃত্ব শ্রমিক দরদের আলখাল্লাটি খুলে ফেলে শিল্পপতি-প্রীতির মহান দায়িত্বটি কাঁধে তুলে নেয়। তাই আজ থেকে ২৬ বছর আগে ১৯৭৭ সালে দ্বিতীয় নির্বাচনী বেতার ভাষণেই সি পি এম নেতা জ্যোতি বসু বলেছিলেন — এবারে বামফ্রন্ট অতীতের যুক্তফ্রন্ট থেকে আলাদা। এবার ফ্রন্টে এস ইউ সি নেই। মুখে মুখে শোনা গেছে শিল্পপতিদের প্রতি আশ্বাসবাণী — আমরা ক্ষমতায় এলে এ রাজ্যে আর জঙ্গি শ্রমিক আন্দোলন হবে না। সে প্রতিশ্রুতি তাঁরা অক্ষরে অক্ষরে রক্ষা করেছেন। সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের ওপর পুঁজিপতি-মালিকদের আক্রমণ যত নির্মম হয়েছে, সি পি এম-ফ্রন্টের নেতা-মন্ত্রীরাও শ্রমিক আন্দোলন দমনে ততই তৎপর হয়েছেন। বিক্ষোভকারী জনতার ওপর পুলিশ ও আশ্রিত গুণ্ডবাহিনীকে লেলিয়ে দেওয়াই শুধু নয়, আন্দোলনে সামিল ভুখা নিরস্ত্র শ্রমিকের বুক লক্ষ্য করে গুলি চালাতেও হাত কাঁপেনি তাঁদের। মরিচঝাঁপির উদ্বাস্তুদের নৃশংসভাবে হত্যা থেকে শুরু করে কলকাতা বন্দর শ্রমিকদের আন্দোলনে গুলি চালিয়ে ৫ শ্রমিক হত্যা, হাওড়ায় ঠেলাওয়ালা ও শ্রমিকদের ওপর গুলিচালনা, শ্যামনগরের গৌরীশঙ্কর জুট মিলে গুলি চালিয়ে শ্রমিক হত্যা — শ্রমিক দরদের এরকম বহু নজির এ রাজ্যে তাঁরা রেখেছেন। মালিকশ্রেণীর প্রতি দায়বদ্ধতার সেই ধারাবাহিকতাতেই আজকের 'উন্নততর' সি পি এম-ফ্রন্টের মুখেও শ্রমিক আন্দোলন চলতে না দেওয়ার হুমকি দিনরাত শোনা যাচ্ছে। শিল্পে 'শান্তির পরিবেশ' বজায় রাখতে দৃঢ়সঙ্কল্প এ রাজ্যের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেববাবুর হাতও তাই পি এফের ন্যায্য পাওনার দাবিতে আন্দোলনরত মুর্শিদাবাদের বিড়ি শ্রমিকদের রক্তে রঞ্জিত। বর্ষায় গঙ্গানদীতে বোল্ডার ফেলে কোটি কোটি টাকা হাতিয়ে নেওয়া সরকার ও কণ্ট্রাক্টরের দুষ্টচক্রের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখাতে গিয়ে আজও প্রাণ দিতে হয় খেটে খাওয়া মানুষ এস ইউ সি আই কমরেড নহীরুদ্দিনকে, সি পি এম শাসিত এই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যেই। সি পি এম-ফ্রন্টের সুশাসনেই এ রাজ্যে সন্তানের মুখে দু-মুঠো ভাত তুলে দিতে না পারার গ্লানিতে সপরিবারে আত্মহত্যা করতে হয় ছাঁটাই হওয়া শ্রমিককে এবং তার প্রতিক্রিয়ায় শ্রমমন্ত্রী মন্তব্য করেন — 'বন্ধ সংস্থার কোনও শ্রমিকের মৃত্যু হলে সরকারের কিছু করার নেই!"

এই হল সি পি এম-ফ্রন্ট শাসিত পশ্চিমবঙ্গে শ্রমজীবী সাধারণ মানুষের 'কিছুটা ভিন্ন' অবস্থার স্বরূপ।

ধান কেনার নামে কৃষকদের বঞ্চিত করে চালকল মালিকদের কোটি কোটি টাকা উপহার দিয়েছে রাজ্য সরকার ঃ ক্যাগ রিপোর্ট

এ রাজ্যে কৃষকদের কাছ থেকে সরকারি দরে ধান-চাল কেনার নামে চালকল মালিকদের কোটি কোটি টাকা উপহার দেওয়া হয়েছে। এর ফলে যতটুকু সাহায্য কৃষকেরা পেতে পারতেন তা থেকেও তাদের বঞ্চিত করা হয়েছে। সম্প্রতি কম্পট্রোলার অ্যাণ্ড অডিটর জেনারেল-এর (ক্যাগ) রিপোর্টে এর বিস্তারিত তথ্য জানা গিয়েছে।

সরকারি নিয়ম অনুযায়ী জেলায় ধান-চাল কেনার বিষয়টি তদারকি করে জেলা পরিষদের সভাধিপতি, জেলা শাসক, খাদ্য ও সরবরাহ দপ্তরের জেলা নিয়ামকদের নিয়ে গঠিত মনিটরিং কমিটি। চালকল মালিকেরা কৃষকদের সরকারি সহায়ক মূল্য দিচ্ছে কিনা এবং চাল সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা পূরিত হচ্ছে কিনা এটা দেখাই এই কমিটির কাজ।

২০০০-২০০১ আর্থিক বছরে সাধারণ মানের ধানের এবং সাধারণ সিদ্ধ চালের সরকারি সহায়ক মূল্য ছিল যথাক্রমে কুইন্টাল প্রতি ৫১০ টাকা এবং ৮২৮ টাকা ৮০ পয়সা। ২০০১-০২ আর্থিক বছরে এই দাম ছিল যথাক্রমে ৫৩০ টাকা ও ৮৭১ টাকা ৯০ পয়সা। সরকার এই দরে চালকল মালিকদের কাছ থেকে ২ লক্ষ ৪০ হাজার টন চাল কিনেছে বর্ধমান, মেদিনীপুর এবং উত্তর ২৪ পরগণা জেলা থেকে। অথচ এই সময়ে চালকল মালিকেরা চাষীদের কাছ থেকে ধান কিনেছে কুইন্টাল প্রতি ৩৯৫ টাকা থেকে ৪৯৭ টাকা ৫০ পয়সা (২০০০-০১) এবং ৩৯২ টাকা ৫০ পয়সা থেকে ৪৭৫ টাকায় (২০০১-০২)। এর ফলে চাষীরা ২১ কোটি ৫১ লাখ টাকা পাওয়া থেকে বঞ্চিত হয়েছে এবং সেই টাকা গিয়ে ঢুকেছে চালকল মালিকদের পকেটে।

লেভির চাল সংগ্রহের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার প্রশাসনিক ব্যয় বাবদ কুইন্টাল প্রতি ৯ টাকা বরাদ্দ করেছিল। ওই কাজ সরকারি কর্মচারীরাই করেছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও '৯৭ সাল থেকে চাল সংগ্রহের খরচ বাবদ মোটা টাকা চালকল মালিকদের পাইয়ে দেওয়া হয়েছে। ক্যাগের রিপোর্ট বলছে — "গত নভেম্বর ১৯৯৭ থেকে চালকল মালিকদের লেভি সংগ্রহের খরচ উদারভাবে প্রদান করে চলেছে রাজ্য সরকার। ফলে ১৯৯৭-৯৮ থেকে ২০০০-২০০১ সময়কালে দপ্তর ১০.০৬ কোটি টাকার অনুচিত আনুকূল্য প্রদর্শন করেছে।" সারা দেশ জুড়ে সমস্ত ক্ষেত্রে যেখানে 'ভরতুকি' তুলে দেওয়া উচিত বলে অহরহ প্রচার করে জনগণের ওপর করের বোঝা বাড়ানো হচ্ছে, সেখানে এই 'অনুচিত আনুকূল্য' কি চালকল মালিকদের কোটি কোটি টাকা ভরতুকি দেওয়া নয় ?

ক্যাগের রিপোর্টে আরও বলছে — সরকারি গুদামে চালের হিসাব নিতে গিয়ে ৪২ হাজার টন চালের কোন হিসাব পাওয়া যায়নি। টাকার অঙ্কে এর দাম হল ৩৩ কোটি ৩৪ লক্ষ টাকা। কেন এটা ঘটতে পারলো তার কারণ অনুসন্ধানে 'ক্যাগ' লক্ষ্য করেছে — "কল মালিকদের থেকে যখন চাল সংগ্রহ করা হয় তখন পুরো মালের পরিবর্তে মাত্র ১০ শতাংশ মালের ওজন করা হয়। ফলে মাল সংগ্রহের সময়ই কম পরিমাণ চাল পাওয়া গেছে, এই ধারণা উড়িয়ে দেওয়া যায় না।"

সি পি এম-ফ্রন্ট সরকারের সাথে ব্যবসায়ীদের মধুর সম্পর্কের প্রকৃতি যাদের জানা আছে, তারাই বুঝবেন এই ৩৩ কোটি ৩৪ লক্ষ টাকা কাদের পকেটে গিয়ে ঢুকেছে। এইভাবে একদিকে জনগণের ট্যাক্সের টাকা নয়ছয় করা, অন্যদিকে ব্যাপকহারে কর চাপিয়ে জনগণের জীবনকে দুর্বিষহ করে তোলা — এই হল সি পি এম রাজত্বের আসল চিত্র।

সিপিএম-এর নীতি ও কার্যকলাপই শ্রমিক আন্দোলনের পথে প্রধান বাধা

চারের পাতার পর

কমেছে? বিলিব্যবস্থা বেড়েছে? প্রতিশ্রুতির কোন্‌টা তাঁরা রক্ষা করেছেন? 'পারস্পরিক ভর্তুকি'র কথাটা বা ধারণাটাও তাঁরা আমদানি করলেন গরিব নিম্নবিত্তের টাকায় কোটিপতি মালিকদের বিদ্যুতের দামে ভর্তুকি দিতেই। আইন থাকা সত্ত্বেও মাশুলবৃদ্ধির ব্যাখ্যাটাও জেনেই তাঁরা মাশুলবৃদ্ধি বন্ধ না করে মামলা লড়ার নাটক করে মালিকস্বার্থই পূরণ করলেন। ঐ বক্তব্য থেকে আরও দু'টি জিনিস প্রমাণ হচ্ছে — সাধারণভাবে বেসরকারিকরণের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে 'স্পষ্ট' ধারণা রেখেই তাঁরা কলকারখানা, শিক্ষা, হাসপাতাল সহ সর্বক্ষেত্রে বেসরকারিকরণ করছেন। আবার বেসরকারিকরণের বিরুদ্ধে গরম গরম বক্তৃতা করে জনতাকে বিভ্রান্তও করছেন। পাশাপাশি কেন্দ্রের নির্দেশে আইনি হাতিয়ার নিয়ে 'পারস্পরিক ভর্তুকি' তাঁরা তুলে দেবেন। এ জন্যই ২০ জুন থেকে বিল বয়কট আন্দোলনকে তাঁরা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির অভিযোগ এনে পুলিশি বর্বরতায় দমন করার চেষ্টা করেছেন। কি অদ্ভুত দ্বিচারিতা ! কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের সাথেও অদ্ভুত মিল।

কেরলে ২০০২-এ ৫ লাখ ২৫ হাজার শিক্ষক ও সরকারি কর্মচারী লাগাতার ধর্মঘট আন্দোলন শুরু করেছিলেন। সরকারি ক্ষমতায় কংগ্রেসের ইউ ডি এফ ছিল। সরকার ৮০,০০০ শিক্ষক কর্মচারীকে উদ্বৃত্ত ঘোষণা করেছিল। তাদের অর্জিত অধিকার, বেতন, বোনাস ইত্যাদির ওপর নির্লজ্জ আক্রমণ প্রতিরোধ করতেই ছিল এই আন্দোলন। 'এসমা' জারি করা হল ধর্মঘট ভাঙতে। সেই অন্দোলনের উত্তাল তরঙ্গে সি পি এমও ভিড়ে গিয়েছিল। তুলেছিল হুংকার — সরকারের দমননীতির ও শ্রমিক-কর্মচারী স্বার্থের ওপর আক্রমণ নামিয়ে আনার প্রতিবাদে। অথচ শিক্ষক-শ্রমিক-কর্মচারীদের দুরবস্থার জন্য দায়ী ছিল প্রধানত তারাই। কংগ্রেস চালিত ইউ ডি এফ সরকারের পূর্বতন সরকার এল ডি এফ সরকার। তারা ৩৫,০০০ কোটি টাকা ঋণ নেয় এ ডি বি'র কাছ থেকে শর্ত সাপেক্ষে। সার্ভিস সেক্টর থেকে কর্মী সংকোচন, ঠিকায় নিয়োগ, সুযোগ সুবিধা ছাঁটাই করার নয়া আর্থিক নীতি প্রয়োগের শর্তে। শর্ত রূপায়নের পরিণতিতেই শ্রমিক-কর্মচারী-শিক্ষকদের জীবন-জীবিকার ওপর নেমে এসেছিল ঐ বিপর্যয়। এখানেও সেই দু'মুখো নীতি — মালিকতোষণ ও প্রতারণা। গোয়েঙ্কাদের ভর্তুকি দেয়, মালিকদের কর ছেড়ে দেয় শত শত কোটি টাকা, আর অর্থ সঙ্কটের দোহাই পেড়ে সর্বক্ষেত্রে বিপুল করের বোঝা চাপায় জনগণের ঘাড়ে। কেন্দ্রের নয়া আর্থিক নীতি নিজেরা অনুসরণ করে, আবার জনগণকে বোকা বানাতে, তাদের বিক্ষোভকে বিপথগামী করতে বিশ্বায়ন, বেসরকারিকরণ, নয়া আর্থিক নীতির বিরোধিতা করে।

পুঁজিবাদী দেশ হিসাবে ভারতবর্ষে গরিব বাড়ছে। ছাঁটাই-শ্রমিক, বেকার যুবক বাড়ছে। গ্রামের খেতমজুর সংখ্যা বাড়ছে লাফিয়ে লাফিয়ে। নিম্নবিত্ত-মধ্যবিত্তর হাত থেকে জমি চলে যাচ্ছে জোতদার-পুঁজিপতিদের হাতে। দারিদ্র্যসীমার নীচে মানুষের সংখ্যাও বাড়ছে। বাড়ারই তো কথা। বেকারি ও ছাঁটাই-এর তথ্য পুঁজিপতিরা যেটুকু স্বীকার করে এরা তাও করতে চায় না। এসোচ্যাম বলছে বছরে ১.৩% থেকে ২.৫%-এ পৌঁছেছে কর্মচ্যুত শ্রমিকের হার। ১৯৯৯-০২ পর্যন্ত হিসাব। 'উন্নয়ন' যা হচ্ছে তা শিল্প-কৃষির পুঁজিপতিদের, বুর্জোয়াশ্রেণীর। অথচ পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় আমজনতার অনিবার্য গরিবি বৃদ্ধিকে তারা গোপন করে জনতার ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধির তথা উন্নয়নের গল্প শোনাচ্ছে। পৃথিবীর কোথাও যা হয় না, হচ্ছে না, হওয়া সম্ভব নয় — এখানে নাকি তাই হচ্ছে। বিশ্বজোড়া মন্দার প্রভাবে এদেশের পুঁজি সংকটগ্রস্ত। ক্রয়ক্ষমতা অধোগামী। শিল্প সংকট এরই অনিবার্য ফল। পুঁজিবাদের এই শোষণ জনিত ফলাফল ও চরিত্রকে আড়াল করতে তারা শিল্পে জঙ্গী শ্রমিক আন্দোলনকে দায়ী করে শান্তির বুলি আওড়াচ্ছে। পুঁজিবাদকে তোষণ করতে নিয়ে চলেছে দু'মুখো নীতি ও কৌশল। এ জন্যই লেনিন 'ধর্মঘট'কে শ্রমিকদের সংগ্রামের প্রাথমিক অধিকার হিসাবে বর্ণনা করলেও প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বলেন — 'ধর্মঘট' শেষ হাতিয়ার। শেষ হাতিয়ার ধর্মঘট হয়ে গেলে বিপ্লবের আর জায়গা থাকে না।

সুতরাং অভিজ্ঞতার প্রেক্ষাপটে প্রমাণ হচ্ছে শ্রেণীসংগ্রাম ও গণআন্দোলনের তীব্রতা বৃদ্ধির বাস্তবতা যেমন যেমন বিকশিত হচ্ছে, নামে বামপন্থী এবং কমিউনিস্ট পার্টি হিসাবে পরিচিতি থাকলেও দলটার জাতীয়তাবাদী চরিত্র-বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত হচ্ছে। পুঁজিবাদী ব্যবস্থার মতবাদিক ধারণা বা আদর্শগত হাতিয়ারই হল জাতীয়তাবাদ। জাতীয়তাবাদ জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীকেই সুরক্ষিত করবে, তাতে অস্বাভাবিক কিছুই নেই। 'জাতীয় স্বার্থ' বলতে শ্রেণীবিভক্ত পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় বুর্জোয়াশ্রেণীর স্বার্থকেই বুঝিয়ে থাকে। এই স্বার্থকে রক্ষা করতে মার্কসবাদ ও বামপন্থার ঝাণ্ডা উড়িয়ে দু'মুখো নীতি ও কৌশলকেই তারা অবলম্বন করেছে। এই রাজনীতির ধারাকেই লেনিন বলেছেন, সোস্যাল ডেমোক্র্যাসি। বলেছেন, এই সব পার্টি আসলে 'লেবার লেফ্‌ট্যানেন্ট অব দি বুর্জোয়াজি'। শ্রম ও পুঁজির অনিরসনীয় দ্বন্দ্বে এই রাজনীতিই শ্রমিকশ্রেণীকে বিভ্রান্ত করে, নিরস্ত্র করে, পুঁজিপতিশ্রেণীর লেজুড়ে পরিণত করে। শ্রমিক বিপ্লবের পক্ষে এরাই প্রধান বিপদ।

সি পি এম নেতৃত্বের এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য খোদ পুঁজিপতিশ্রেণীরও ধরতে অসুবিধা হয়নি। হেরাল্ড রিভিউ-এর ৭ এপ্রিল '৮৫-র সংখ্যায় জনৈক শিল্পপতির বিবৃতি ঃ ষাট দশকের পশ্চিমবঙ্গের জঙ্গি শ্রমিক আন্দোলন এখন পুরোপুরি স্তিমিত। এ জন্য পুরো কৃতিত্বের দাবিদার হলো সি পি আই (এম) পরিচালিত শ্রমিক সংগঠন সিটু (CITU)। শিল্পপতি গোয়েঙ্কাও মস্ত বড় সার্টিফিকেট দিয়ে বলেছেন, জ্যোতিবাবু খুব ভালো মুখ্যমন্ত্রী। .....সি পি আই (এম) এখন বৃহৎ পুঁজিপতিদের সম্পর্কে তার দৃষ্টিভঙ্গি দ্রুত পাল্টে ফেলেছে। (ফিনানসিয়াল টাইমস, ২১-৭-৮৫)। সাম্প্রতিককালে শিল্পপতিদের সভায় পশ্চিমবঙ্গের শিল্পের পরিস্থিতি নিয়ে লোকদেখানো সমালোচনা করেন প্রধানমন্ত্রী বাজপেয়িজী। তারপর বিশিষ্ট শিল্প-পতিরা প্রকাশ্যে বর্তমান মুখ্যমন্ত্রীকে 'শিল্পবন্ধু' বলেই সংবাদমাধ্যমে মতামত দিয়েছেন। শিল্পপতিদের স্বার্থের জন্য ধারাবাহিক পদক্ষেপের মধ্যে দিয়ে যে নৈকট্য — তার ফলেই জাতীয়তাবাদী কংগ্রেস, বিজেপি, জয়ললিতার দল, তৃণমূল প্রভৃতি দল এবং তাদের সরকারের সঙ্গে সি পি এমের বোঝাপড়া এবং নীতি ও কর্মপন্থার সামঞ্জস্য দেখা যাচ্ছে। দেখা যাচ্ছে গণআন্দোলন-ধর্মঘট সম্পর্কেও দৃষ্টিভঙ্গির সমতা। সি পি এম চালিত ফ্রন্ট কোন সমস্যায় পুঁজিপতিদের ফেলেনি। একচেটিয়া পুঁজিপতিগোষ্ঠী টাটা সংস্থারও এটা খোলাখুলি স্বীকৃতি ঃ আমি কমিউনিস্টদের পছন্দ করিনা। তবে জ্যোতিবাবু ও তার সরকার আমাদের সামনে কোন সমস্যার সৃষ্টি করেনি। (চেয়ারম্যান মোদী, ২১-৭-৮৫, ফিনানসিয়াল টাইমস্)

বুর্জোয়াশ্রেণী সি পি আই (এম)-কে কমিউনিস্ট পার্টি হিসাবে অন্তত মনে করে না। যদিও ব্যাপক সংখ্যক শোষিত জনতার মধ্যে সি পি আই (এম)কে কমিউনিস্ট পার্টি হিসাবে মনে করার বিভ্রান্তি থেকেই গিয়েছে। এখানেই তার শক্তি — যা দিয়ে সে বুর্জোয়াশ্রেণীকে সেবা করে, রক্ষা করে শ্রেণীসংগ্রাম ও গণআন্দোলনের হাত থেকে। মহান স্ট্যালিন শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবের সামনে এই শ্রম ও পুঁজির আপসের শক্তির বিধবংসী ক্ষমতা সম্পর্কে হুঁশিয়ারি দিয়ে এক মহাসত্যকে ঘোষণা করে আমাদের সতর্ক করেছেন ঃ সোস্যাল ডেমোক্র্যাসিকে পরাস্ত না করে পুঁজিবাদকে খতম করা অসম্ভব।

আসলে সি পি আই (এম) বা সি পি আই কোনদিনই কমিউনিস্ট পার্টি হিসাবে গড়ে উঠতে পারেনি। অর্থাৎ পুঁজিবাদী রাষ্ট্রযন্ত্রকে উচ্ছেদ করার শ্রেণীদল হিসাবে, হাতিয়ার হিসাবে গড়ে ওঠা তার পক্ষে সম্ভব হয়নি। ব্যক্তি, সমাজ, ইতিহাসের পরিবর্তন, পার্টির চরিত্র — সবই প্রক্রিয়ার ফল। সঠিক জ্ঞান, সঠিক প্রক্রিয়ার অভাবের বিষময় ফল বোঝাতেই প্রবাদ আছে "শিব গড়তে বানর গড়া।" কাজেই এই পার্টিটার উদ্দেশ্য ও চরিত্র রাষ্ট্রবিপ্লবের উপযুক্ত না হওয়ায় আপসকামী জাতীয়তাবাদী ভোটসর্বস্ব রাজনীতির গোলকধাঁধায় তারা শ্রমিকশ্রেণীকে ফাঁসিয়ে দিয়ে পুঁজিবাদের আয়ুবৃদ্ধি করছে। বুর্জোয়াশ্রেণীর দলগুলোর সাথে তার দ্বন্দ্ব — শ্রেণীশত্রুর বা শ্রেণীর রাজনীতির সংঘর্ষ নয়, নির্বাচনী দ্বন্দ্ব। 'সত্তরের দশকের স্বৈরতান্ত্রিক ও চরম শত্রুতার মনোভাব তারা (কংগ্রেস) বদলে ফেলেছে। তাই আমাদের পলিসিও বদলানোর প্রয়োজন হয়েছে।' অনিল বিশ্বাস একথা বলেছেন টাইমস অব ইণ্ডিয়ার সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে (১৯-৫-০২)। এমনকি "... হাতুড়ী আর আজ আমাদের দলের প্রতীক থাকতে পারে না। এই পরিবর্তন করতে হবে তাড়াহুড়ো করে নয়, রাতারাতি নয়, সতর্কভাবে।" একথাও বলে দিলেন। তাদের কথায় কংগ্রেস তার শ্রেণীচরিত্র বদলে ফেলেছে!

ক্ষমতায় গিয়ে সিপিএমের এমন চরিত্র হয়নি। যারা বলেন — এসব ক্ষমতায় যাওয়ার ফল — একারণেই তা ভুল। যখন তারা পশ্চিমবাংলায় এক পয়সা ট্রাম ভাড়া বৃদ্ধির বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছে (যেমন অন্য রাজ্যে এখন করছে), তখনও তা করেছে সোস্যাল ডেমোক্র্যাসির ভোটসর্বস্ব রাজনীতির সব উপাদান নিয়েই। শ্রেণীচরিত্রের এই বিশিষ্টতার জন্য কংগ্রেস, বিজেপি সহ অন্যান্য দলগুলির সাথে তাদের দ্বন্দ্ব নিতান্তই সরকারি ক্ষমতার বাঁটোয়ারার দ্বন্দ্বে পর্যবসিত হয়েছে। সি পি এম-এর এই দ্বন্দ্বে ক্ষমতার জন্য দরকার হচ্ছে মস্তান, অর্থ, খুন, সন্ত্রাস, বুথ দখল, বিরোধীপক্ষের কণ্ঠরোধ করা, পুলিশকে আইনের ঊর্ধ্বে এক স্বৈরাচারী শক্তিতে পরিণত করার মত ফ্যাসিবাদী পদক্ষেপ। সি পি এমের মতো জাতীয় কমিউনিস্ট পার্টিগুলো একদিকে চাতুরীর সাহায্যে মালিক-শ্রেণীকে সেবা করে, তাদের নীতিগুলোকে শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে চালু করার পথ প্রশস্ত করে — অন্যদিকে শোষণের ফলে বিক্ষুব্ধ শ্রমিকশ্রেণীকে বিভ্রান্ত করে, বিপথগামী করে বুর্জোয়াশ্রেণীকে সংগ্রামের আঘাত থেকে রক্ষা করে শেষপর্যন্ত নির্বাচন-সর্বস্বতার গোলকধাঁধায় বিপ্লবের আবেগকে হত্যা করে। শাসকশ্রেণীর নির্ভরযোগ্য এই দল এইভাবে দু'মুখো নীতি ও কৌশল হাতিয়ার করে শ্রমিকশ্রেণীর সর্বনাশ করে। ফ্যাসিবাদ প্রতিষ্ঠার পথ প্রশস্ত করে।

বিপ্লবী আন্দোলনের অভিজ্ঞতার নিরিখে সোস্যাল ডেমোক্র্যাসির এই বিচিত্র ও বিধবংসী ক্ষমতা সম্পর্কে মহান নেতা, এ যুগের বিশিষ্ট মার্কসবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষের ঐতিহাসিক মূল্যায়ন এ প্রসঙ্গে স্মরণীয় ঃ "একদিন সোস্যাল ডেমোক্র্যাসির গর্ভ থেকে ফ্যাসিবাদের জন্ম হয়েছিল। আজ সোস্যাল ডেমোক্র্যাসিই ফ্যাসিবাদের শেষ আশ্রয়স্থল।" তিনি আরও বলেছেন, "সোস্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টিগুলো এযুগে পুরোপুরি এক্সপোজড হয়ে যাওয়ার পর এবং কমিউনিস্ট আন্দোলন থেকে সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে যাওয়ার পর আন্তর্জাতিক সাম্যবাদী আন্দোলনের মধ্যে আজ যেসব কমিউনিস্ট পার্টি ইতিমধ্যেই শোধনবাদী পার্টিতে পরিণত হয়েছে এবং এদের মধ্যে যারা দেশে দেশে ক্রমেই জাতীয় কমিউনিস্ট পার্টির রূপ পরিগ্রহ করছে (অর্থাৎ নামে কমিউনিস্ট পার্টি হলেও কার্যত সমস্ত দিক থেকে সোস্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টির চরিত্র নিয়ে নিয়েছে) সেইসব পার্টিগুলির মধ্যে অন্ধতা ও গোঁড়ামির সাথে যদি মিলিট্যান্ট ক্যারেক্টার যুক্ত হয়, তাহলে মার্কসবাদের ঝাণ্ডা উড়িয়েই এই সমস্ত পার্টিগুলির এ যুগে ফ্যাসিবাদী পার্টিতে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা পুরোমাত্রায় বর্তমান।"

তাই শ্রেণীসংগ্রাম হোক, গণআন্দোলন হোক, শ্রমিক-কর্মচারীদের অর্থনৈতিক স্বার্থরক্ষার প্রশ্নে হোক, অর্জিত অধিকার রক্ষার সংগ্রামের প্রশ্নেই হোক — সোস্যাল ডেমোক্র্যাটিক রাজনীতির পুরোধা সি পি এমের দু'মুখো নীতি ও প্রতারণার কৌশলকে পরাস্ত করতে পারাটা একান্ত জরুরি। শ্রমিকশ্রেণী ও শোষিত জনতার মধ্যে তার প্রভাবকে উচ্ছেদ করার সংগ্রাম ও প্রয়োজনবোধের সঙ্গে শ্রেণীসংগ্রাম ও গণআন্দোলনের বিকাশ, অর্জিত অধিকার রক্ষা ও বিস্তৃতির সংগ্রামের সাফল্য জড়িয়ে আছে। জড়িয়ে আছে বিপ্লবী নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার ঐতিহাসিক প্রয়োজনবোধ ও বাস্তবতা। মনে রাখতে হবে, কলকাতা হাইকোর্টও কিন্তু ধর্মঘটকে বেআইনি ঘোষণা করেছিল। সংগ্রামের শক্তি কমজোরি হলেই উপযুক্ত মুহূর্তে ধর্মঘটের অধিকার এ রাজ্যেও আর থাকবে কিনা, মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে। ধর্মঘট ও আন্দোলনের অধিকারের ক্রমিক সংকোচনের পথেই একদিন তা ঘটতে পারে।

সারা দেশে ও রাজ্যে এমন এক পরিস্থিতিতে আগামী ২১ আগস্ট বাংলা বন্‌ধ তাই গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক সংগ্রামের সুগভীর তাৎপর্য বহন করছে।

ঘাটশিলায় ৫ আগস্ট

শ্রেণী বিপ্লব ও দলের সঙ্গে একাত্ম হওয়ার আহ্বান

৫ই আগস্ট সর্বহারার মহান নেতা ও আমাদের শিক্ষক ও পথপ্রদর্শক, এস ইউ সি আই দলের প্রতিষ্ঠাতা কমরেড শিবদাস ঘোষের ২৭তম মৃত্যুবার্ষিকী ঝাড়খণ্ড রাজ্যের ঘাটশিলায় অবস্থিত মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-কমরেড শিবদাস ঘোষ চিন্তাধারা অনুশীলন কেন্দ্রে উদ্‌যাপিত হয়। ওই দিন সকালে রক্তপতাকা উত্তোলন করে কমরেড শিবদাস ঘোষের মূর্তিতে মাল্যদান করেন ঝাড়খণ্ড রাজ্য সাংগঠনিক কমিটির সম্পাদক কমরেড হেম চক্রবর্তী। অনুশীলন কেন্দ্রের পক্ষে মাল্যদান করেন কমরেড মলয় বসু।

দুপুর বারোটায় অধ্যয়ন কেন্দ্রে স্মরণসভার অয়োজন করা হয়। ঝাড়খণ্ড রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা সংগঠক, কর্মী, সমর্থক, জনসাধারণ এই সভায় যোগ দেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন ঝাড়খণ্ড রাজ্য সাংগঠনিক কমিটির সম্পাদক কমরেড হেম চক্রবর্তী। কমরেড শিবদাস ঘোষের উপর রচিত সঙ্গীত দিয়ে সভার কাজ শুরু হয়। প্রথমে বিহার রাজ্য সম্পাদক কমরেড অমৃতেশ্বর চক্রবর্তীর মৃত্যুতে, তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে ২ মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।

সভার প্রধান বক্তা, দলের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড রণজিৎ ধর বলেন — এদেশে আন্তর্জাতিক সাম্যবাদী নেতৃত্ব কর্তৃক স্বীকৃতিপ্রাপ্ত কমিউনিস্ট পার্টি নামে দল থাকা সত্ত্বেও, কমরেড শিবদাস ঘোষ নতুন করে সর্বহারাশ্রেণীর একটি দল প্রতিষ্ঠা করেন এই কারণে যে, ঐ দলটির গঠন পদ্ধতিতেই মৌলিক ত্রুটি থাকার জন্য প্রথম থেকেই তা সঠিক কমিউনিস্ট পার্টি হিসাবেই গড়ে উঠতে পারেনি। তিনি সঠিকভাবেই উপলব্ধি করেছিলেন যে, সঠিক বিপ্লবী দল ছাড়া যেহেতু বিপ্লব হতে পারেনা, তাই সঠিক বিপ্লবী দল গঠনই মুক্তিকামী শ্রমজীবী জনতার প্রথম ও সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কাজ। কমরেড শিবদাস ঘোষের জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি হল এস ইউ সি আই পার্টি গঠন এবং একদল এমন নেতা ও কর্মী তৈরি করা যাদের জীবনে বিপ্লব ও পার্টি ছাড়া আর কিছুই নেই। এই নতুন দল গঠনে সেদিন তাঁর সাথে যাঁরা এগিয়ে এসেছিলেন তাঁদের নিয়ে যে তীব্র সমাজতান্ত্রিক মতবাদিক সংগ্রাম তিনি শুরু করেন, সেই সংগ্রামের পথেই একই উদ্দেশ্য নিয়ে একই প্রক্রিয়ায় একই চিন্তাপদ্ধতির ভিত্তিতে জীবনের সমস্ত দিক ব্যাপ্ত করে মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে প্রয়োগ করার মধ্য দিয়ে যাঁরা সফলভাবে মার্কসবাদী বিপ্লবী হিসাবে নিজেদের গড়ে তুলতে পেরেছেন, তাঁরাই এই দলের নেতা হয়েছেন। দল ও বিপ্লবের সাথে নিজের ব্যক্তিগত জীবন, এমনকি পছন্দ, অপছন্দ, প্রেম, ভালবাসা সবকিছু একাত্ম করে দিতে না পারলে এ দলের নেতা হওয়া যায় না।

কমরেড রণজিৎ ধর আরও বলেন যে, কমরেড শিবদাস ঘোষ বলতেন বিপ্লবের চেয়ে বড় আদর্শ, বিপ্লবী জীবনের চেয়ে বড় জীবন আর কিছু নেই। এ জীবনে দুঃখকষ্ট, অনাহার, জেলে যাওয়া সবকিছু থাকা সত্ত্বেও যে গৌরব ও আনন্দ আছে — এ আর কোথাও নেই। কমরেড ঘোষ বলতেন মর্যাদা নিয়ে বেঁচে থাকার একটাই অর্থ তা হল, মানুষ হিসাবে মাথা উঁচু করে বেঁচে থাকা। আর আজকের সমাজে মানুষ হিসাবে বেঁচে থাকার একটাই উপায়, তাহল বিপ্লবী হিসাবে বেঁচে থাকা।

মঞ্চে উপবিষ্ট কমরেড রণজিৎ ধর ও কমরেড হেম চক্রবর্তী

কমরেড রণজিৎ ধর উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলীকে কমরেড ঘোষের চিন্তা ও ধ্যানধারণাকে ঠিকমত বুঝে বিপ্লবী হওয়ার সংগ্রামে আত্মনিয়োগ করার মধ্য দিয়ে ৫ই আগস্টকে এক সংকল্প দিবস হিসাবে পালন করার আহ্বান জানান।

আন্তর্জাতিক সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে সভা শেষ হয়।

ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের উপর আক্রমণের প্রতিবাদে সারাদিনব্যাপী অবস্থান

ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ ইউনিটি ফোরামের আহবানে গত ১ আগস্ট ব্যাঙ্ক কর্মচারীরা কলকাতায় এলাহাবাদ ব্যাঙ্কের প্রধান কার্যালয়ের সামনে সারাদিনব্যাপী অবস্থান করেন এবং বিক্ষোভ কর্মসূচীতে সামিল হন। এই অবস্থান উপলক্ষে ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঞ্চার হয়। প্রতিষ্ঠিত ট্রেড ইউনিয়নগুলো যথা এ আই বি ই এ, বি ই এফ আই, এন সি বি ই যেখানে বহুদিন ধরে আন্দোলনের রাস্তা পরিহার করে আত্মহননের নীতি গ্রহণ করায় কর্মচারীদের অর্জিত অধিকারগুলো কেড়ে নেওয়া হচ্ছে, যেখানে এইসব ইউনিয়নগুলো একের পর এক কর্মচারীবিরোধী চুক্তি করছে, সেখানে ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ ইউনিটি ফোরামের এই আন্দোলনের কর্মসূচী ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের কাছে এক আশার বার্তা বহন করে আনে। এই কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করতে ফোরামের সর্বভারতীয় নেতৃবৃন্দ কমরেড বিজয়পাল সিং, কমরেড এ. ইউ. খান, কমরেড রাজীন্দার সিং, কমরেড পূর্ণ বেহেরা উপস্থিত ছিলেন। অবস্থানে বক্তব্য রাখেন ফোরামের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক কমরেড জগন্নাথ রায়মণ্ডল এবং সভাপতি কমরেড অমর রায়। বিভিন্ন ব্যাঙ্কের বহু কর্মচারী এই অবস্থানে অংশগ্রহণ করেন।

মুর্শিদাবাদ

'বন্যা-ভাঙন প্রতিরোধ কমিটি' ভাঙন এলাকা পরিদর্শন করলেন

বছর বছর পদ্মা-গঙ্গা-ভৈরবের ভাঙনে মুর্শিদাবাদ জেলায় ইতিমধ্যে লক্ষাধিক মানুষ বাড়ি-জমি সবকিছু হারিয়ে সর্বস্বান্ত হয়েছেন। এই বর্ষায় ভগবানগোলার বীনপাড়ার ১০০টি বাড়ি, আলাইপুরে ২০টি বাড়ি কয়েকদিনের মধ্যে পদ্মার ভাঙনে তলিয়ে গেছে। গঙ্গার ভাঙনে বেলডাঙ্গা ১নং ব্লকের মেলেনিপাড়া গ্রাম হারিয়ে গেছে; মীর্জাপুর গ্রামের গঙ্গার বাঁধ ভাঙছে, যে বাঁধ ভাঙলে বেলডাঙ্গা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। মুর্শিদাবাদ জেলা বন্যা-ভাঙন প্রতিরোধ কমিটির পক্ষ থেকে কমিটির সভাপতি প্রাণরঞ্জন চৌধুরী, অন্যতম যুগ্মসম্পাদক সাধন রায়, অফিস সম্পাদিকা খাদিজা বানু এবং সাজেম আলি সহ এক বিশেষ প্রতিনিধি দল ভাঙন দুর্গত এলাকা পরিদর্শন করেন এবং সাধারণ মানুষের অভিযোগ শোনেন। মানুষের অভিযোগ, ভাঙনের আশঙ্কা করে বারবার বি ডি ও'কে জানানো সত্ত্বেও বি ডি ও কোন পদক্ষেপ নেননি এবং এখনও পর্যন্ত গৃহহারা মানুষের ত্রাণ ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা হয়নি। বন্যা-ভাঙন প্রতিরোধ কমিটির পক্ষ থেকে ঐদিনই বি ডি ও'র কাছে দাবি সনদ পেশ করা হয় এবং আগামী ১২ আগস্ট দুর্গত মানুষের ত্রাণ-পুনর্বাসন সহ বন্যা-ভাঙন প্রতিরোধে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের দাবিতে জেলাশাসকের দপ্তরের সামনে অবস্থান বিক্ষোভের কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়। উল্লেখ্য, মুর্শিদাবাদ জেলায় ইতিপূর্বে বন্যা-ভাঙন প্রতিরোধ কমিটির নেতৃত্বে গৌরবোজ্জ্বল আন্দোলন গড়ে ওঠে, পুলিশের গুলিতে শহীদ হন কমরেড নহিরুদ্দিন। ঐ আন্দোলনের ফলেই ভগবানগোলার আখেরিগঞ্জে পদ্মার পাড় বাঁধাই সম্পূর্ণ হয়েছে। জেলায় সার্বিক ভাঙন প্রতিরোধের দাবিতে এই কমিটির নেতৃত্বে দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলন গড়ে তোলার প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে।

জলপাইগুড়ি

ম্যালেরিয়া প্রতিরোধের দাবিতে ডি ওয়াই ও

সারা ভারত ডি ওয়াই ও'র রাজগঞ্জ ব্লক কমিটির পক্ষ থেকে ৩০ জুলাই রাজগঞ্জ মগড়াডাঙ্গী বি এম ও এইচ-এর কাছে এবং জেলা কমিটির পক্ষ থেকে ১ আগস্ট জলপাইগুড়ি মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ও বিভাগীয় কমিশনারের কাছে, জলপাইগুড়িতে ভয়াবহ ম্যালেরিয়ার আক্রমণের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে স্মারকলিপি প্রদান করা হয়। সংগঠনের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছেঃ জলপাইগুড়িতে ম্যালেরিয়া আক্রান্ত এলাকায় জরুরি ভিত্তিতে রোগ নির্ণয় কেন্দ্র খুলতে হবে, নিয়মিত ডি ডি টি স্প্রে করতে হবে, রোগীদের চিকিৎসার সমস্ত দায়িত্ব সরকারকে বহন করতে হবে, ম্যালেরিয়ায় মৃত ব্যক্তিদের পরিবারকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক বলেন, সরকার প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যকর্মী নিয়োগ করছে না, ওষুধপত্রের সরবরাহ অপ্রতুল। ফলে আমরা উদ্ভূত সমস্যার মোকাবিলা করতে পারছিনা। ডি ওয়াই ও'র পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, সরকার অবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলা হবে।

মেদিনীপুর

সরকারি হাসপাতালের বাড়ি নির্মাণে দুর্নীতি এস ইউ সি আই-এর বিক্ষোভ

পূর্ব মেদিনীপুর জেলার তমলুকের জানুবসান প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের প্রসূতিসদন সম্প্রসারণের জন্য গৃহনির্মাণে ব্যাপক দুর্নীতি ও কারচুপির প্রতিবাদে এস ইউ সি আই নোনাকুড়ি লোকাল কমিটির পক্ষ থেকে ঐ স্বাস্থ্যকেন্দ্রের মেডিক্যাল অফিসার, স্থানীয় বিডিও ও পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতির কাছে ডেপুটেশন দিয়ে দোষী ব্যক্তিদের কঠোর শাস্তির দাবি জানান হয়। প্রতিনিধিরা অভিযোগ করেন, ঐ গৃহনির্মাণে ৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ হয়েছে, অথচ খুবই নিম্নমানের ইট, বালি, সিমেন্ট, লোহার রড ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়েছে এবং নির্মাণে প্রচণ্ড গাফিলতি করা হয়েছে।

এই আন্দোলনের চাপে পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি অভিজ্ঞ ইঞ্জিনিয়ার দিয়ে যতদিন না তদন্ত হচ্ছে, ততদিন কাজ বন্ধ রাখার নির্দেশ দিতে বাধ্য হয়েছেন।

এই ডেপুটেশনে প্রতিনিধিত্ব করেন কমরেডস্ তপন ভৌমিক, শশাঙ্ক পাঁজা, সত্যেশ্বর সাঁতরা, বেলারাণী পাঁজা (দাস) ও বাসুদেব ধাড়া।

মালিক তোষণ বন্ধ কর

এস ইউ সি আই-এর রাজ্য সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ৮ আগস্ট এক বিবৃতিতে বলেন—

"লক-আউট, শ্রমিক ছাঁটাই ও পি এফ-এর টাকা আত্মসাৎ করার ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কয়েক বছর ধরে ভারতবর্ষে এগিয়ে আছে এবং শ্রমিক ধর্মঘটে অনেক পেছনে আছে। এই সরকারের তথ্য দেখাচ্ছে, সি পি আই (এম) নেতৃত্ব সরকারি গদি দীর্ঘস্থায়ী করার স্বার্থে কিভাবে দেশি-বিদেশি মালিক কর্তৃক শ্রমিকদের উপর বেপরোয়া আক্রমণকে সাহায্য করে যাচ্ছে এবং শ্রমিক আন্দোলনকে দমন করছে।

আমরা সি পি আই (এম) পরিচালিত সরকারের শ্রমিকস্বার্থ বিরোধী ও মালিক তোষণনীতির প্রত্যাহার দাবি করছি।"

MM & PO /WB / RNP 288/2003 R. No 5268 / 60

গণদাবী ৫৬ বর্ষ / ৩ সংখ্যা

কমরেড অমৃতেশ্বর চক্রবর্তীর শেষযাত্রা

৬ আগস্ট বিহার রাজ্য কমিটির সম্পাদক প্রয়াত কমরেড অমৃতেশ্বর চক্রবর্তীর মরদেহ পাটনায় বিহার রাজ্য অফিসে নিয়ে আসা হয়। ৩ আগস্ট ক্যালকাটা হার্ট ক্লিনিক অ্যাণ্ড হসপিটালে ক্যান্সারে আক্রান্ত অবস্থায় চিকিৎসাধীন থাকাকালীন শ্বাসপ্রশ্বাসের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে তিনি শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বিহারের রাজ্য নেতারা সকাল থেকেই শোকাকুল হৃদয়ে পাটনা স্টেশনে অপেক্ষা করছিলেন। পৌঁছুবার পর গাড়িতে করে তাঁরা মরদেহ অফিসে নিয়ে আসেন। অফিসের সামনে রাস্তায় তখন অসংখ্য কমরেডের ভিড়। মৃত্যুর আগে শেষ ক'টা বছর এই অফিসেই কমরেডদের সাথে তিনি থাকতেন এবং এখান থেকেই বিহার রাজ্য সংগঠন পরিচালনা করতেন। কমরেডদের কাছে তিনি ছিলেন যথার্থ পিতার মত। বুক দিয়ে সকলকে রক্ষা করেছেন। যে কোনও সমস্যায়, যে কোনও আঘাতে কমরেডরা তাঁর কাছে ছুটে আসতেন। সময়ের কোনও বাধা ছিল না, শোনারও কোনও ক্লান্তি ছিল না। তাঁর সংবেদনশীল মন, ধৈর্যের সাথে সকলের বক্তব্য শোনা, সহজ কথায় সমাধানের পথ দেখানো কমরেডদের মন থেকে সব উদ্বেগ, সব দুঃখ দূর করে দিয়ে পরম নির্ভরতায় দাঁড় করিয়ে দিত। অত্যন্ত রুচিশীল ও কৌতুকপ্রিয় মানুষ ছিলেন। ছোট ছোট কথায় মনের ভার নিমেষে মুক্ত করে দিতে পারতেন। ব্যক্তিগত কারণে অন্যকে কখনো আঘাত দেননি, নিজে আঘাত পেলে তা বুঝতেও দেননি। অত্যন্ত সহজ, সরল ও অনাড়ম্বর জীবনযাপন করতেন। পার্টির বাইরে ব্যক্তিগত জীবন বলতে কিছুই ছিলনা। পার্টি এবং বিপ্লবের সাথে নিজেকে বিলীন করে দিয়েছিলেন।

মরদেহ অফিসে নিয়ে আসার সাথে সাথে অফিসে গভীর শোকের ছায়া নেমে আসে। কত বছরের কত ঘটনার কত স্মৃতি কমরেডদের মনে ভিড় করে আসে। উপস্থিত সকলে কান্নায় ভেঙে পড়েন। বাইরের বিভিন্ন জেলা থেকে তখনও কমরেডরা ক্রমাগত আসছেন। এসেছেন ঝাড়খণ্ড রাজ্য থেকেও নেতা-কর্মীরা। কিছুদিন আগে বিহার থেকে ঝাড়খণ্ড রাজ্য আলাদা হওয়ার আগে পর্যন্ত সমগ্র বিহারের তিনিই রাজ্য সম্পাদক ছিলেন। গভীর শোকাকুল পরিবেশে প্রয়াত নেতাকে শেষ বিদায় জানাতে একে একে অন্যান্য বামপন্থী দলের নেতা ও শহরের বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবীরাও উপস্থিত হন।

মরদেহে মালা দিয়ে শ্রদ্ধা জানাবার সময় প্রত্যেকের চোখে ছিল জল, মুখে ছিল গভীর বিষাদের ছাপ। প্রথমে বিভিন্ন জেলা থেকে আসা পার্টি ও গণসংগঠনের কর্মীরা একে একে সাড়ি দিয়ে মাল্যদান করেন। বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান প্রখ্যাত চিকিৎসক ডাঃ পি গুপ্ত, বিহার মাধ্যমিক পরীক্ষা বোর্ডের প্রাক্তন চেয়ারম্যান এবং পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীন ইতিহাস বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক ও পি জয়সওয়াল, পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক পি মুখার্জী, টি কে ঘোষ অ্যাকাডেমির প্রাক্তন অধ্যাপক পি এন মাহাতো, ঝাড়খন্ড রাজ্যের ঘাটশিলা স্কুলের প্রাক্তন ও বর্তমান প্রধান শিক্ষক যথাক্রমে শান্তি ঠাকুর এবং আর পি সিং। এছাড়া কে কে পান্ডে, মহম্মদ ইয়াসিন, বিহার রাজ্য সেভ এডুকেশন কমিটির পক্ষে বি প্রশান্ত মাল্যদান করেন।

মরদেহে মাল্যার্পণ করে শ্রদ্ধা জানান বিহার সিপিআই-এর রাজ্য সম্পাদক জালালুদ্দিন আনসারি, রাজ্যসম্পাদকমন্ডলীর সদস্য পি কে গাঙ্গুলি ও ভূতপূর্ব বিধায়ক রামনরেশ পান্ডে, সিপিএম-এর বিহার রাজ্য সম্পাদক গনেশ শংকর বিদ্যার্থী, আরএসপি-র বিহার রাজ্য সচিব তারাকান্ত প্রকাশ, সিপিআই(এম-এল)-এর কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কে ডি যাদব।

মাল্যদান করে বিপ্লবী শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন দলের কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষে রণজিৎ ধর, বিহার রাজ্য কমিটির পক্ষে শিবশংকর, অরুণ সিং, অমরকুমার পান্ডে, বিহার রাজ্য এ আই ডি এস ও প্রেসিডেন্ট রামপ্রীত রায় ও সম্পাদক দীপক কুমার, এ আই ডি ওয়াই ও সম্পাদক ইন্দ্রদেও রায়, এ আই এম এস এস সেক্রেটারি সাধনা কুমারী, এ আই কে কে এম এস-এর বালেশ্বর রসুলপুরী, ইউ টি ইউ সি-এল এস সেক্রেটারি শিউলাল প্রসাদ; ঝাড়খন্ড রাজ্য কমিটির পক্ষে সম্পাদক হেম চক্রবর্তী, রবীন সমাজপতি ও আর এস শর্মা, ঝাড়খন্ড ইউ টি ইউ সি-এল এস-এর পক্ষে রণজিৎ মোদক, বিমল দাস, এ আই এম এস এস-এর সরলা মাহাতো, লিলি দাস, কেয়া দে।

প্রয়াত নেতার মরদেহ নিয়ে বিশাল মিছিল

শ্মশানঘাটে প্রয়াত নেতাকে লাল সেলাম দিয়ে শেষ বিদায় জানাচ্ছেন দলের নেতা ও কর্মীবৃন্দ

মাল্যদান শেষ হওয়ার পর নেতারা অশ্রুসজল চোখে কাঁধে করে মরদেহ নিয়ে এসে গাড়িতে তোলেন। মিছিলের প্রথমে 'কমরেড অমৃতেশ্বর চক্রবর্তী লাল সেলাম' লেখা বিশাল ফেস্টুনের পর প্রয়াত নেতার ৭৫ বৎসর বয়সে মৃত্যুর প্রতীক হিসাবে দলের ৭৫ জন কর্মী অর্ধনমিত রক্তপতাকা নিয়ে সুশৃঙ্খলভাবে দাঁড়ান। তার পিছনে থাকেন রাজ্য কমিটির নেতৃবৃন্দ। গাড়িতে শবদেহের পাশে দাঁড়ান কমরেড রণজিৎ ধর, কমরেড শিবশংকর ও কমরেড অরুণ সিং। গাড়ির পিছনে দলের শত শত কর্মী-সমর্থক দু'পাশে সারিবদ্ধ ভাবে দাঁড়িয়ে স্লোগান দিতে থাকেন 'কমরেড অমৃতেশ্বর চক্রবর্তী অমর রহে', 'মার্কসবাদ-লেনিনবাদ কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারা জিন্দাবাদ', 'এস ইউ সি আই জিন্দাবাদ'। মিছিল চলতে শুরু করে। মিছিলের মাঝে মাঝে দলের সঙ্গীতগোষ্ঠী আন্তর্জাতিক সংগীত এবং মহান মার্কসবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষের ওপর রচিত সঙ্গীত গাইতে গাইতে চলতে থাকেন।

প্রচন্ড রোদের তাপের মধ্যে মিছিল নালা রোড পার্টি অফিস থেকে শুরু হয়ে কদমকুঁয়া, ঠাকুরবাড়ি রোড, গান্ধী ময়দান, ভগৎ সিং চক, অশোক রাজপথ হয়ে গুলবীঘাট শ্মশানে পৌঁছায়। শ্মশানঘাটেও অন্যান্য বামপন্থী দলের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিত সমস্ত নেতা-কর্মী-সমর্থক অশ্রুসজল চোখে 'লাল সেলাম' জানিয়ে প্রয়াত নেতাকে শেষ বিদায় জানান। তারপর তাঁর মরদেহ বৈদ্যুতিক চুল্লীতে দেওয়া হয়। 'কমরেড অমৃতেশ্বর চক্রবর্তী অমর রহে' স্লোগান দিতে দিতে কর্মীদের কান্নায় শ্মশানে এক গভীর বিষাদের পরিবেশ সৃষ্টি হয়।

'ধর্মঘট প্রসঙ্গে সুপ্রিম কোর্টের রায় সভ্য সমাজ মানতে পারে না'

— ইউ টি ইউ সি-এল এস'এর সর্বভারতীয় সভাপতি

তামিলনাড়ুর সরকারি কর্মচারী ও শিক্ষকদের ধর্মঘট প্রসঙ্গে ধর্মঘটের অধিকার সংক্রান্ত সুপ্রিম কোর্টের রায়ের প্রতিবাদ জানিয়ে ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণীর সর্বভারতীয় সভাপতি কমরেড অনিল সেন গত ৭ আগস্ট নিম্নলিখিত বিবৃতি দিয়েছেন ঃ

"তামিলনাড়ুর ধর্মঘটী সরকারি কর্মচারী ও শিক্ষকদের উপর সরকারের ফ্যাসিস্ট আক্রমণের বিরুদ্ধে আনীত আবেদনগুলির ফয়সালা করতে গিয়ে সুপ্রিম কোর্টের দুই সদস্য বিশিষ্ট ডিভিশন বেঞ্চ যে সর্বনাশা রায় দিয়েছে, যার বহু দিক থেকে সুদূরপ্রসারী ক্ষতিকর পরিণাম বর্তাবে — তাকে কোন সভ্য এবং গণতান্ত্রিক সমাজ মেনে নিতে পারে না। বিশেষ করে আমাদের মত একটি শ্রেণীবিভক্ত সমাজে সরকারি কর্মচারী সহ সমস্ত শ্রমজীবী মানুষ যেখানে ক্রমাগত অধিকতর মাত্রায় বহুমুখী আক্রমণের শিকার হচ্ছেন, সেখানে তাঁদের কষ্টার্জিত অধিকার রক্ষা করতে ধর্মঘটের মাধ্যমে শেষপর্যন্ত লড়াই করে যাওয়া ছাড়া কোন বিকল্প নেই — এ তাঁদের সংগঠিত হওয়ার এবং যৌথ দর-কষাকষির অধিকারেরই অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। এটা অবশ্যই মনে রাখা দরকার যে, এমন কিছু অধিকার আছে যেগুলি জনগণের মৌলিক অধিকার এবং সেগুলি আইন, সংবিধান অথবা বিচারবিভাগীয় নির্দেশ-নিরপেক্ষভাবেই অবস্থান করে এবং সেগুলি কোন নির্দেশের অধীন নয়। এটা চিন্তার বিষয় যে, সুপ্রিম কোর্ট এই মৌলিক অধিকারগুলিকে বিবেচনার মধ্যে রাখেনি এবং রাজনৈতিক দলগুলিকে ধর্মঘট থেকে বিরত থাকার জন্য তার এক্তিয়ার বহির্ভূতভাবে উপদেশ দিয়েছে। এটাও গভীর উদ্বেগের বিষয় যে, বিচারব্যবস্থায় শ্রমিকশ্রেণীবিরোধী প্রবণতা ক্রমাগত বাড়ছে।

এই মারাত্মক পটভূমিকায় আই এল ও'র ৮৭, ৯৮ ও ১৫১ নং সিদ্ধান্তকে স্বীকৃতি দিতে এবং ধর্মঘটের অধিকারকে অন্যতম মৌলিক অধিকার হিসাবে মেনে নিতে ভারত সরকারকে বাধ্য করার জন্য সমস্ত শ্রমজীবী মানুষ, সরকারি কর্মচারী ও শিক্ষকদের কষ্টার্জিত অধিকার রক্ষার্থে দৃঢ়তার সঙ্গে এগিয়ে এসে ঐক্যবদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য আমার আহবান জানাচ্ছি। সাথে সাথে দেশের সমস্ত শুভবুদ্ধিসম্পন্ন গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষকে এই আন্দোলনকে নিজেদের আন্দোলন মনে করে এর পাশে দাঁড়ানোর আবেদন জানাচ্ছি।"

দলের নতুন বিহার রাজ্য সম্পাদক নির্বাচিত

৬ আগস্ট বিহার রাজ্য কমিটির এক জরুরি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার প্রথমে প্রয়াত বিহার রাজ্য সম্পাদক কমরেড অমৃতেশ্বর চক্রবর্তীর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে ২ মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। সভায় সর্বসম্মতিক্রমে বিহার রাজ্য কমিটির নতুন সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন কমরেড শিবশংকর।

সম্পাদক মানিক মুখার্জী কর্তৃক ৪৮, লেনিন সরণী, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক গণদাবী প্রিন্টার্স এ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত।
ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২৪৪-০২৫১ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৪৪২২৩৪, ২২৪৪১৮২৮ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৪৬-৫১১৪ ই-মেল ঃ suci_cc@vsnl.net